উপকণ্ঠ

এভারেস্ট বুক হাউস

এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি কাল্পনিক। তবু কোনো চরিত্রের সঙ্গে কোথাও যদি মিল ঘটে যায় সেটা সম্পূর্ণই আকস্মিক এবং লেখকের দায়িত্বের বাইরে। এই সঙ্গে বলে রাখা ভাল, দ্বিতীয় পর্বের কিছু অংশ এর আগে কোনো এক সাময়িক পত্রে ছোট গল্পাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বিহঙ্গবিলাস

প্রজাপতির রঙ

প্রথম পরশ

দুয়ার (যন্ত্রস্থ)

দু'টি তারার আকাশ (যন্ত্রস্থ)

প্রথম পর্ব

এক

সকাল দুপুর কি সন্ধ্যা সব সময় এ-গলির রূপ এক। দু' পাশে বস্তী ; ছোট; প্রায় কোনরকমে মানুষ-গলা অপরিসর গলি-ঘুপচি, টালি আর খাপড়া ছাওয়া ন্যুব্জ-নোয়ানো বাড়ির সারি ; জলের কল, পায়খানা, নোংরা দুর্গন্ধ-ওঠা নর্দমা আর ডাস্টবিনের ফাঁক ফোঁকর গলে একেবেঁকে এগিয়ে গেছে এই গলি। এমনিতে চিনবার উপায় নেই ; মোড়ের দিকে, কাশীপুর রোড থেকে বাঁ-হাতি ঢুকলে, ঠিক মাথার ওপর একটা দোতলা বাড়ির গায়ে এক পেরেকে আটকানো কর্পোরেশনের দেওয়া একটা নিশানা আছে। রাস্তার নামের ফলক। ফলকের একটা পাশ নেমে গেছে। ঝুলে পড়েছে অনেকটা। দেখলে মনে হয় খাড়া। চোখে জ্যোতি থাকে তো তার লেখাটা আবিষ্কার করা চলে। অনেক কষ্টে। ফলকটা নীল রঙের ছিল আগে, লেখাটা সাদায়—এখন এক বিচিত্র রূপ ধরেছে এই ফলক। রঙের চলটা উঠেছে জায়গায় জায়গায়, কোথাও দু' এক বিন্দু, কোথাও ইঞ্চি দুয়েক জায়গা ধরে। সাদার ফুটকি ফাটকিতে ভরেছে ফলকটা। তবু কষ্ট করলে, চেষ্টা করে পড়লে গোটা নামটা উদ্ধার করা যায়। গলির নাম রাখহরি দাস লেন।

রাখহরির 'খ'টা চলটে বলটে, ভেঙে একটা অন্য অক্ষর হয়েছে। ঠিক যেন 'ব'। আর 'হ'-টা মুছে গেছে বেমালুম। ফলে এক-আধটু পড়তে শেখা কোনো লোক কি বর্ণপরিচয় শেষ করা অল্প বয়েসী কোনো ছেলেমেয়ে, তারা যদি পড়ে এ-ফলকটা, অবাক হবে। আর খুব গরিব ঘরের ছেলেমেয়ে, যারা বছরে দু'বছরে এক আধবার মিঠাই মণ্ডা মিষ্টান্ন খেতে

পায় তারা নামটা পড়ে নিচের ঠোঁট চাটবে একবার। বানান ভুল হোক, তবু নামটা সঠিক। রাবরি। রাবরি দাস লেন।

রাখহরি দাস লেনের শুরুতে গুটিকয় কারখানা। লোহার। সেই কারখানার ধোঁয়া, হাতুড়ির শব্দ, লোহার রডের ঝনঝনানি আর কুলি কাবারির চিৎকার এই মৃতপ্রায় থুত্থুরে গলিটাকে বাঁচিয়ে রাখে। গরম করে। অনুপান দিয়ে মাড়া মকরধ্বজ খাইয়ে একটা বুড়ো রোগীকে বাঁচিয়ে রাখা যেন। আরও আছে এ-গলিতে, অনেক রব ; মাল-বোঝাই ঠেলাওয়ালাদের হুসিয়ারী, টানা রিকশার ঠুনঠান শব্দ, মেথর মুদ্দফরাসের আলগা মুখ খিস্তি কিংবা চায়ের দোকানের আড্ডাবাজ বখাটে ছোড়াদের অশ্লীল বাক্যবিনিময় আর খেউর—এই শুনে এ-গলির বাসিন্দাদের ঘুম ভাঙে। আর এ-সব শুনে শুনে সমস্ত দিন গিয়ে রাত নামে। আলো জ্বলে। চিৎকার বাড়ে। বাড়তে থাকে। তারপর মাঝরাত কি শেষরাতের কাছাকাছি সময়ে সামান্য নিঝুম হয় গলিটা। যেন আফিঙখোর নেশাগ্রস্থের মত ঝিম মেরে পড়ে থাকে।

এককালে পাকা ছিল এ-পথটা। পীচের মসৃণ ঝকঝকে রাস্তায় নিঃসঙ্কোচে জামা জুতো পরে হেঁটে যাওয়া যেত। এখন সে জৌলুস নেই। রৌদ্রে জলে পীচ গলে, ক্ষয়ে ধুয়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। তারপর ঠেলা, লরী রিকশা আর ময়লা-গাড়ির চাকার চাপে চাপে পীচ উঠে গেছে কবে। ইট ভেঙে এবড়ো খেবড়ো হয়েছে পথ। মাটি বেরিয়ে পড়েছে। ধুলো, কাদা, আবর্জনা আর ময়লা জমে যেন উপচানো জলে ভাসা এই গলিটা এখন বাতিলের পর্যায়ে। এর ওপর একদিন বৃষ্টি হল কি, রাস্তা ভাঙল। রাজ্যের যত আবর্জনা, এঁটো-কাঁটা, তরকারীর খোসা, শালপাতা, কাগজের ঠোঙা, মল—

সব এসে জমল রাস্তায়। পায়ে হাঁটা দূরে থাক, ঠেলা রিকশা পর্যন্ত ঢুকবে না এ-পথে।

এই পথে ঠিক মধুসূদন কেবিন বরাবর এসে থামল দলটা। গুটি দুই ঠেলা আর দু'খানা রিকশা। ঠেলায় মালপত্র বোঝাই। বাক্স বিছানা, তক্তপোষ, উনুন, কয়লা, ঘুঁটের বস্তা—ঠেলা দু'টোয় প্রায় গাদাগাদি অবস্থা। ছেঁড়া মাদুরের খানিকটা ঝুলে পড়েছে, চেয়ারের একটা পায়া কাৎ হয়ে ঠেলার পাশ দিয়ে নিচে নেমেছে; আর শটি বার্লি হরলিক্স কি ওষুধ টষুধের খালি কৌটো শিশি বোতল ঝনঝন করছিল।

ঠেলা দু'টো আগে, পেছনে রিকশা। পর পর দু'টি।

মধুসূদন কেবিনের চা-য়ে মশগুল ছোকরার দলে একটা গুঞ্জরণ উঠল। দরজা ডিঙিয়ে সব ক-টা চোখ পড়ল এসে রাস্তায়। খানিক সময়ের জন্য চা খেতে ভুলল এই দল। যেন অবাক হল। না, ঠেলা দু'টো কি আগের রিকশার বুড়োবুড়িকে দেখে নয়, শেষের রিকশায় ওদের চোখ।

বেলা পড়ে আসছে। মরে এসেছে রোদের তেজ। এখন বিকেল, চারটা বাজে কি বাজবে।

কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল; সকালেও খানিকক্ষণ। তার ফলে রাখহরি দাস লেনের অবস্থা জলে জলময়। ড্রেন-উপচানো, রাস্তাছাপা নোংরা জলে কী ভীষণ দুর্গন্ধ!

দলটা থেমে গিয়েছিল এইখানে। ঠেলা দু'টো আগে, পেছনে পর পর দু'টি রিকশা। প্রথম রিকশা থেকে কমলাপতি নামলেন। এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত মধুসূদন কেবিনটাই চোখে পড়ল তাঁর। কমলাপতি বারান্দায় উঠলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চা-য়ে মশগুল ছোকরার দলটা কাপ ফেলে একসঙ্গে যেন উঠে আসতে চাইল।

কমলাপতি ঘাড় চুলকোলেন একবার। সামনের ছেলে

ছু'টিকে জিজ্ঞেস করলেন শেষ পর্যন্ত, 'আচ্ছা, মানে 'অবিনাশ-বাবু এখানে থাকেন, এ পাড়ায় ?'

'অবিনাশবাবু!' একটি ছেলে ভ্রূ কোঁচকাল, অবিনাশ কি বলুন তো ?'

'চক্রবর্তী কি ?' অন্য ছেলেটি রুমালে মুখ মুছল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ—চক্রবর্তী।' কমলাপতি মাথা নাড়লেন, 'এই পাড়াই তা হলে ? কোন বাড়িটা ?'

'আসুন ?' রুমালে মুখমোছা ছেলেটি পায়ের চটি ছাড়ল, বলল, 'চলে আসুন।'

রাখহরি দাস লেন জলে জলময় দেখালেও আসলে হাঁটু পর্যন্ত ডোবে না। পায়ের পাতা ডুবে বড় জোর আরও ইঞ্চি তিনেক ভেজে। সেই নোংরা ভাসা-আবর্জনার মধ্য দিয়ে ঠেলা আর রিকশাগুলো টালমাটাল খেতে খেতে সতের নম্বর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

এখানে অতটা না হলেও কালো ময়লা থিকথিকে জলে পায়ের পাতা ভেজে। মায়ের কোল লেপটে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিল পারুল; সুষমা তাকে কোলে করে নামল। ঘোমটাটা সামান্য টেনেছে সুষমা। হাজার বয়েস হোক, তবু তো অচেনা অজানা জায়গা। দশটা লোক-লস্করও আছে এ-দিক ও-দিক। পারুলকে ডান কোলে নিয়ে, বাঁ-হাতে শাড়িটা সামান্য ওঠাল সুষমা, মেয়েদের দিকে তাকিয়ে চোখ ইশারা করল, এবার নাম তোরা।

মধুসূদন কেবিনের সামনে, যেখানে কয়েক মুহূর্তের জন্য রিকশা আর ঠেলাগাড়িগুলো থেমেছিল, সেখান থেকেই আঁচলে নাক চেপে আছে নীহার। যা দুর্গন্ধ বাব্‌বা! বার দুই কনুয়ের গুঁতো দিয়েছে নীহার কমলাকে, আস্তে বলেছে, 'ইস্‌ তোর গা ঘিনঘিন করছে না দিদি ?'

'চুপ কর!' কমলা ধমকে উঠেছে। 'সবতাতে তোর বাড়াবাড়ি।'

বাস্তবিক সবতাতে একটু বাড়াবাড়িই নীহারের। স্বভাবটাও অন্যরকম, যা কমলার সঙ্গে মেলে না। নীহার দেখতে সুন্দর। রঙটাও ফরসাই। বেশ ফরসা; উজ্জ্বল। অন্ততঃ কমলার গায়ের কালো মরা সামান্য উজ্জ্বলতার তুলনায় নীহারের মুখ চোখ নাক এবং গায়ের রঙের ধরনটা অনেক সুন্দর। স্বাস্থ্যটাও ভাল। গায়ে-গতরে মাংস আছে। আর জৌলুস। কি লম্বা কি চওড়া—সব দিক দিয়ে নীহারকেই বরং বড় মনে হয়। কমলার চেয়েও বড়। এ-সব ছাড়াও স্বভাবের কথা উঠলে বলা যায়, বড় ঘরে কোনো টাকা-পয়সাঅলা ধনীর ঘরেই জন্মানো উচিত ছিল মেয়েটার। আমাদের মত গরিব ঘরে ওকে মানায় না। স্নো-পাউডার, ভাল শাড়ি গয়না আর জুটবে না আমাদের, জুটবে না···কমলা নীহারের কথা ভাবতে ভাবতে নিজেদের অবস্থার ভাবনায় চলে এল। এবং এক করুণ বিমর্ষতা আর হতাশার ছায়া ফুটল ওর মুখে।

আবার কন্নুইয়ের গুঁতো মারল নীহার, 'এই দিদি, নাম। নাম না।'

কমলা চমকে উঠে বিরক্ত-চোখে তাকাল নীহারের দিকে।

অবিনাশ বাড়ি নেই। তার স্ত্রী ননীবালা তুপুরের গুমোট গরমে অস্থির হয়ে শাড়ি-সায়া অল্প আলগা করে দিয়ে বসে বসে তালপাখার হাওয়া খাচ্ছিল এতক্ষণ, খানিক আগে ছারপোকা মারার শখ গেল তার। পাখাটা জোরে জোরে মেঝের ওপর ঠুকে পাখা থেকে পড়া ছারপোকাগুলো টিপে টিপে মারছিল আর বিড়বিড় করে আপনমনে সম্ভবতঃ

ছারপোকাগুলোর চৌদ্দপুরুষকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করছিল। খুব বিরক্ত, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল ননীবালা।

মেদে মাংসে ননীবালার গতরখানা দেখনাই। যেমন মোটা তেমনি বেঁটে। মেদবহুল দেহের ভাঁজ-টাজে অতিরিক্ত মাংস ঝোলা ঝোলা। পেট পাছা থলথলে। ননীবালা রাগে বিরক্তিতে গাল দিচ্ছিল ছারপোকাদের, 'হাবাতের গুষ্টি মর মর মর। এ-মরাগুলোর জ্বালায় দু' দণ্ড আরাম করে চোখ বুজবার জো নেই গা। পিথ্যীমিতে আর লোক পেলিনা, আমার গতরখানাই দেখলি? আ—মর!' পাখা থেকে পড়া একটা ছারপোকা দু' আঙুলের ফাঁকে ধরে চোখের সামনে তুলে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে টিপে মারল ননীবালা দারুণ প্রতিহিংসায়। তারপর সেই বদরক্ত মাখা আঙুল দু'টো নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকে, পাছার কাপড়ে মুছল। মুছে আবার পাখা ঠুকতে বসল।

মাঝে একবার সন্ধ্যাকে ডেকেছিল ননীবালা। সন্ধ্যা আসেনি।

এ-মেয়েও হয়েছে তেমনি। যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। দু' দণ্ড ঘরে বসবে না; সারাদিন টই টই টই। আর হাড় জ্বালিয়ে মারল আমার। ভর দুপুরে আড্ডাটা কিসের! …ননীবালা নিজের মনে মেয়েকে শাসাচ্ছিল। সোমথ মেয়ে তার একটু লাজ সরম বলে কথা নেই! অসম্ভব রাগে মেঝের ওপর ধাই ধাই করে পাখাটা গুঁতোচ্ছিল ননীবালা, এমন সময় দরজায় লোক।

'কাকে চাই?' ননীবালা গতর সামলে উঠল। গায়ে জামা নেই, শাড়ি-সায়াও আলগা। কোনরকমে ঢেকেঢুকে আঁচলটা মাথায় টেনে উঠে এল ননীবালা।

উঠানে ততক্ষণে সকলেই এসে গেছে। সুষমা, নীহার,

পারুল। এরা সকলে মাঝ উঠানে দাঁড়িয়ে। কমলাপতি মধুসূদন কেবিন থেকে ধরে আনা ছেলেটিকে নিয়ে অবিনাশের ঘরের দরজা বরাবর বারান্দা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছেন।

এতক্ষণ এই উঠানটা ফাঁকা ছিল। লোকজন দেখা যাচ্ছিল না। এখন লোক দেখে আশেপাশের ঘর থেকে একটি দু'টি করে মানুষ এগুতে লাগল। যেন সকলে অবাক হয়েছে।

কমলার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পারুল এ-দিক ও-দিক দেখছিল। শুধু পারুল নয়, কমলা নিজেও এবং নীহার। খুব করুণ এবং ভয় ভয় চোখে পারুল লোকগুলোকে দেখল। প্রায় ভিড় করে আসা এ-বাড়ির একটি দু'টি ছেলেমেয়ে আর বউ-ঝিদের।

'অবিনাশবাবুকে চাইছেন ওঁরা,' সঙ্গের ছেলেটি বলল ননীবালাকে।

'তা কোত্থেকে আসা হয়েছে?' ননীবালা ঘোমটাটা আরও একটু টেনে, মাথা নিচু করে এবং তার স্বাভাবিক ভাঙা গলার স্বরকে যতটা সম্ভব চিকন এবং মোলায়েম করে জিজ্ঞেস করল।

'শ্যামবাজার থেকে এসেছি আমরা', কমলাপতি জবাব দিলেন। 'আমার নাম কমলাপতি…'

'ও', ননীবালা চমকে উঠল যেন এবং লজ্জায় জিভে কামড় দিল।

এতক্ষণে ব্যাপারটা ধরতে পারল ননীবালা। অবিনাশ তাকে বলেছিল বটে, কিন্তু আজই যে আসবে এঁরা এমন কোনো কথা বলেনি। আর লজ্জা পাওয়ারও কারণ আছে একটা। যাঁরা এসেছে, যে-সে লোক নয় তারা। অবিনাশ বলেছিল, কর্পোরেশন অফিসের চাকুরে। বড় চাকুরে। এক সময় এই কমলাপতিবাবুর দপ্তরেই কাজ করেছে অবিনাশ। ফাইলপত্র দেওয়া নেওয়া, চা জলটা পর্যন্ত।

সে-চাকরী অবশ্য নেই অবিনাশের; সে এখন ডকে কাজ করে। ছোট সরকারের কাজ। কিন্তু তা হলে কি হবে, এক সময় যখন কমলাবাবু মনিব ছিলেন, মাথার ওপরের অফিসার, তখন তাকে খায়-খাতির করা তার উচিত।

ননীবালা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তা অতবড় চাকুরে মানুষ এই বস্তিতে…'

'ভাগ্য ভাগ্য,' অবিনাশ বলেছে। 'ভাগ্যে সব করায়। চাকরি বাকরি নেই, কী আর করবে।'

ননীবালা আর কিছু বলেনি, জিজ্ঞেসও করেনি কিছু। হয়তোবা অবিনাশের মুখে এই পরিবারের দুঃখ এবং অভাবের তাড়নার কথা শুনে সামান্য বেদনা অনুভব করতে পেরেছিল। সে-বেদনার রূপটা যে কেমন, কোন রকমের তা জানে না ননীবালা। তবু তার বিশ্বাস—এত বড় চাকুরে, বড়লোক মানুষ, সে যদি এমন অবস্থায় পড়ে, হাতে পয়সা না থাকে, খেতে পরতে না পায় তবে…তবে—ননীবালা কথাটা আর ভাবতে পারেনি।

এখন লজ্জা আর সঙ্কোচ দুই মিলিয়ে ননীবালার অবস্থাটা বিচিত্র রূপ ধরেছে। কি যে বলবে ভেবে পাচ্ছে না। নাকি এখন বসাবে নিজের ঘরেই? কিন্তু ঘরের যা অবস্থা—এই ছোট ঘর, তছনছ জিনিসপত্র, অগোছাল আর নোংরা তার মধ্যে এই ভদ্রলোকদের বসানো সঙ্গত হবে কিনা সে-কথাও ভাবছিল ননীবালা। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে উঠানে জড় হয়ে আসা এ-বাড়ির লোকগুলোকে দেখল ননীবালা। সন্ধ্যাকে খুঁজল। মেয়েটা কাছে থাকলেও তবু কথাটথাগুলো বলতে পারত। কিন্তু সে আবাগীটা গেল কোথায়!

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকবার পর এ-ঘরেই ছিল সন্ধ্যা।

ননীবালা মাদুর পেতে বুকের ওপর থেকে শাড়ির আঁচল খসিয়ে শুয়ে শুয়ে হাওয়া খাচ্ছিল, তারপর এক সময় চোখ বুজলো ননীবালা। আর সেই ফাঁকে সন্ধ্যা কেটে পড়ল। কাটব কাটব করছিল অনেকক্ষণ ধরে। সন্ধ্যার মন ছটফট করছিল সেই সকাল থেকেই।

অবশ্য সকালেও বেশ খানিকক্ষণ রুমা বৌদির ঘরে আড্ডা মেরে এসেছে। রুমা বৌদি বড় ভাল। ভালও বাসে সন্ধ্যাকে। সকালে বিকেলে চা খাবার সময় নিয়মিত এক কাপ করে সন্ধ্যার জন্য বরাদ্দ। অবশ্য রেখে দিতে হয় না, চায়ের কেটলিটা উনুন থেকে নামিয়ে কখন ঘরে নিয়ে যায় রুমা বৌদি, তার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখে সন্ধ্যা। আর ঠিক সময়টি বুঝে হাজির হয়।

রুমা হাসে, 'গন্ধ পেয়েছ বুঝি ?'

'তা পেয়েছি। কেটলি থেকে ঢাললেই যে তোমার হাতের গন্ধে ভূরভূর করে সারা বাড়ি।' সন্ধ্যা চাটাইয়ের একটা আসন টেনে নিয়ে রুমার গা ঘেঁষে বসে।

'নাও', রুমা এক কাপ এগিয়ে দেয়, 'প্রাণ জুড়ালো এবার ?'

'তা যা বলেছ বৌদি, তোমার কাছে থেকে থেকে এ-সব অভ্যাস হয়েছে…'

সন্ধ্যাদের বাড়িতে চায়ের পাট নেই। অবিনাশ খাটিয়ে মানুষ, গতর খাটিয়ে পয়সা রোজগার। কিন্তু চায়ের ওপর বীতশ্রদ্ধ। অবিনাশ জল খায়, ঘটি ঘটি জল। বলে, 'জলে তাগদ আনে, বল। ওই যে বলে না, অজীর্ণে ভেষুজম বারি, জীর্ণে বারি বলপ্রদম, তাই।'…মা-ও চা খায় না। বলে, 'খেলে আমার ঘুম হয় না ; যত রাজ্যের কুস্বপ্ন দেখি রাত্রে।' অবশ্য মা যে চা খায়নি কোনদিন, তা নয়। একবার কে যেন

বলেছিল মাকে চা খেতে। চা খেলে নাকি মেদ কমে। গায়ের মাংসের বাহুল্য কমাবার জন্য মা চা খেল দিনকয়েক। সে অবিনাশের সঙ্গে কত ঝগড়া-ঝাঁটি করে, তবে। তা বড় জোর চার দিন কি পাঁচ দিন। আর সব দিনই মায়ের সে কি শোসানি। রোজ জিভ পুড়ত মা-র। মা-র সেই সময়কার অবস্থার কথা ভাবলে এখনও হাসি পায় সন্ধ্যার।

এখন চা খাওয়া হচ্ছে না যদিও, তবুও হঠাৎ হেসে উঠল সন্ধ্যা।

'হাসছ যে,' অখিল তাকাল সন্ধ্যার দিকে।

'এমনি।' মুখে আঁচল চাপা দিল সন্ধ্যা।

সকাল থেকে এই জন্যই ঘুর ঘুর করে এ-ঘরে আসছিল সন্ধ্যা। আর যাচ্ছিল।

আকাশ কালো ছিল সকালের দিকে, তারপর নামল বৃষ্টি। ভয়ানক জোরে। নালা টালা ভাসল; রাস্তাও। উঠোনের জল বন্যার মত ছুটল রাস্তার দিকে। এমন ভয়ানক জল আর এ-বছর হয়নি। ঝুপঝাপ দরজা বন্ধ হল সব ঘরের। একটা ছু'টো জানলাও যা আছে। সন্ধ্যাদের ঘরের দরজা কি জানলা কোনোটাই বন্ধ করতে হয় না। বৃষ্টির ছাট আসে সাধারণত ঘরের পেছন দিক থেকে। পেছনে কোন জানলা নেই সন্ধ্যাদের ঘরে। আছে একটিমাত্র জানলা, সেও বাঁ-দিকে। ওটা ঠিক যে জানলা, তা নয়; বরং ঘুলঘুলিই বলা চলে।

বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছিল সন্ধ্যা। বৃষ্টি দেখতে ওর ভালই লাগে। চমৎকার। কিন্তু মনটাই যা কেমন কেমন করে। ভয়ানক উদাস আর কেমন এক ধরনের ছুঃখ যে, সন্ধ্যা তার রূপ কি পরিচয় কোনোটাই বোঝে না। ধরতেও পারে না। অথচ কেন যেন সমস্ত মনটা হু-হু করে, বড় খালি খালি লাগে বুকটা। আঠারোটা বসন্ত পার হওয়া বুকে অচেনা

এক দমকা হাওয়ার দাপট কাঁদে। চাপা বাষ্পের মত সেই হাওয়াটা উথল-পাথল করে ভয়ানক বেদনায়।

বৃষ্টিটা প্রায় ধরে এল অনেক পরে। কতটা সময়, সে হিসেব করতে পারে না সন্ধ্যা। তবে সেই শুরু থেকে এই অবধি বারান্দাতেই বসেছিল ও। সমসমানি কমল বৃষ্টির, বড় বড় ফোঁটাগুলো ছোট হয়ে এল। আর এত যে জোরে পড়ছিল, অসংখ্য অগুন্তি ফোঁটা, অবিরল—তা কমে এল। বৃষ্টির রূপটা তখন শান্ত। ফোঁটার রূপটা সরু হতে হতে চিকন হল। তারপর কুয়াশার মত ক্ষীণ।

অখিলকে তখন দেখতে পেল সন্ধ্যা। রুমা বৌদির ভাই, অখিল।

বৃষ্টির ছাট কমে এলেও ইলশেগুঁড়ির চেয়ে সামান্য স্পষ্ট বৃষ্টি পড়ছিল। একটা ছোট রুমালে মাথা ঢাকা অখিলের। ধুতি জামার কোনো কোনো অংশ ভেজা। চটিটা ভিজে আমসত্ত্ব প্রায়। উঠানে ধরে থাকা জলের মধ্য দিয়ে ছপ ছপ করে রুমা বৌদির ঘরের দিকেই যাচ্ছিল অখিল। জোরে।

রুমার ঘরের দরজা বন্ধ। অখিল কড়া নাড়ল।

সন্ধ্যা দেখতে পেল অখিলের জামার পেছন দিকটা ভিজে সপসপ করছে। এই বৃষ্টিতে ভিজে কড়া নাড়বে অখিল; আরও ভিজবে। আরও। ওকে ডাকবে কিনা ভাবছিল সন্ধ্যা। এই বারান্দায় এসে দাঁড়ালে বৃষ্টির হাত থেকে অন্ততঃ বাঁচত অখিল। সন্ধ্যাদের গামছা দিয়ে গা-মাথা মুছলে জল বসত না গা-য়ে। কিন্তু সন্ধ্যা ডাকল না। ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও নয়।

এই উঠান একেবারে ফাঁকা; কেউ নেই। সব ক-টি ঘরের দরজা জানলা বন্ধ। কেবল সন্ধ্যা একা বারান্দায় বসে। ভেতরে ননীবালা হয়তো এই অবসরে আর একটু গড়িয়ে

নিচ্ছে। গরম আর গুমোট ভ্যাপসা একটা অস্বস্তিতে রাত্রির ঘুম ভাল হয়নি তার। এখন ঠাণ্ডা পড়েছে; শরীর জুড়োনো ঠাণ্ডা—এখন নিশ্চয় মা মাতুরটা পেতে নিয়ে কাৎ হয়েছে। সন্ধ্যা ভাবল। আর খুব ইচ্ছা হল সন্ধ্যার, খুব—একবার অখিলকে ডাকে। কিংবা অন্য একটা কথাও ভাবল সন্ধ্যা। রুমা বৌদি দরজা খুলছে না। কড়া নাড়ছে অখিল, তবুও না। সন্ধ্যা ভাবল ও নিজে গিয়ে ডাকবে কিনা রুমা বৌদিকে।

বৃষ্টি থামল অনেক পরে। শেষ দিকে দমকা হাওয়ার মত কয়েকটা ঝাপটা বইল জোরে। কুয়োপাড়ের কাঁঠাল গাছটা থেকে থেকে ভয়ানক নড়ল। ডালপালা আছাড় খেল, টুপটাপ পাতা খসে ছড়িয়ে পড়ল উঠোনময়; তারপর সম্পূর্ণভাবে থেমে গেল বৃষ্টিটা। আর বারান্দার কোণে চুপচাপ বসে থাকা সন্ধ্যার মনের উদাসী শূন্য শূন্য হাওয়ার দাপটটাও কমল বুঝি।

সন্ধ্যা এল অনেক পরে। সম্ভবতঃ শব্দটা কানে গিয়েছিল। কেটলি নাড়াচাড়ার শব্দ। সাধারণতঃ বৃষ্টিটৃষ্টি না হলে রুমা বৌদির ঘরের দক্ষিণ দিকটায় যে বাঁশ-চাটাইয়ের খানিক আব্রু ওখানেই রান্নাবান্না করে রুমা বৌদি। এ-বাড়ির সকলেই তাই। অন্ততঃ রুমাবৌদির ঘরের মতন যাদের ঘব, কোনো বারান্দা নেই, বৃষ্টি কিংবা দুর্যোগের সময় শোবার ঘরেই রান্নাবান্না করে তারা।

সন্ধ্যা এসে দাড়াল ঘরে। জামা-কাপড় ছেড়ে দিদির একটা শাড়ি লুঙ্গির মতন করে পড়েছে অখিল। তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে কথা বলছে রুমার সঙ্গে।

'খুব ভিজলেন তো?'

'হ্যাঁ', অখিল উঠে বসল, 'তুমি দেখলে কেমন করে?'

'বারান্দায় ছিলাম। ভাবলাম ডাকি···,'সন্ধ্যা তক্তপোষের কোণায় বসল, 'তা যে-জোরে কড়া নাড়াচ্ছিলেন, শুনতে পেতেন কি ?'

'ঠিক শুনতে পেতাম।' অখিল হাসল।

সকালের দিকটা কেটেছিল এমনি। দুপুরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ননীবালা যখন ঘুমলো, তারপর এ-ঘরে এল সন্ধ্যা। রুমা বৌদির ঘরে।

খুবই বৃষ্টি হয়েছিল সকালে। রোদ উঠল তারপর। রোদের ভয়ানক তেজ। কী ভয়ানক গরমই না পড়ল। সমস্তটা দুপুর এই ঘরে বসে গল্প করল সন্ধ্যা। তিনজনে। রুমা সন্ধ্যা আর অখিল। অখিল তার চাকরির গল্প বলছিল। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে ধন্না দেওয়ার গল্প। চার বছর ধরে নাকি অখিল ঘুরছে ঘুরছে আর ঘুরছে।

'আমার এক বন্ধু বলে কি জানিস দিদি ?' অখিল রুমার দিকে তাকাল। 'বলে, টু' পাইস যদি গুঁজতে পার, চাকরি হতে ক-দিন ?'

তারপর অখিল তার বন্ধুর গল্পই বলতে শুরু করল।

দরজা একটা খোলা ছিল এ-ঘরের ; অন্যটা সামান্য ভেজানো। উঠানের খানিক অংশ, কুয়োপাড়ের দিকটা দেখা যাচ্ছিল। সন্ধ্যাদের ঘর আর তার সামনের দিকটা ভেজানো দরজাতে ঢাকা। সুতরাং কমলাপতিরা কখন এসেছে সে খেয়াল নেই কারও। এ-ঘরের তিনজনের কারও নয়। বুঝতে পারল ওরা পরে।

'কা-রা যেন এসেছে।' অখিল দরজার পাল্লার ফাঁকে তাকাল উৎসাহের সঙ্গে।

'কা-রা!' রুমা উঠল। সন্ধ্যাও।

ঘর থেকে বেরুল না কেউ। তিনজনের কেউ না।

'হু' তিনটি মেয়ে আছে, না?' অখিল কথা কইল।

'হ্যাঁ। সন্ধ্যাদের বাড়িতে এসেছে।' রুমা বলল পাল্লার ফাঁকে চোখ রেখে।

'আমাদের বাড়িতে?' সন্ধ্যা বিস্মিত হল। 'কিন্তু কাউকে তো চিনতে পারছি না!'

অবিনাশ ছিল না বটে, কিন্তু তাই বলে বিশেষ কোনো অসুবিধেয় পড়তে হল না। বাড়িঅলাকে বলে চাবি আনিয়ে রেখেছে অবিনাশ। আজই যে আসবেন কমলাপতিরা তেমন কিছু নির্দ্দিষ্টভাবে না বললেও, চাবিটা ননীবালার কাছেই রেখেছিল অবিনাশ। সুতরাং ঘর খুলতে কোনো ঝামেলা হল না।

কমলাপতি নিজেই তদারকি করে মালপত্র নামাচ্ছিলেন ঠেলাওলাদের দিয়ে। সুষমা আর কমলা ঘরে ঢুকল। নীহার ঢুকতে গিয়ে সরে এল দরজার কাছ থেকে। নাকে আঁচল চাঁপা দিল নীহার।

সমস্ত ঘরটা ধুলোয় ধুলোময় হয়ে আছে। ভাড়াটে আসেনি সম্ভবতঃ অনেক দিন। ছেঁড়া কিছু বইয়ের পাতা। নোংরা। একটা দু'টো খাতার পাতা, কাগজের ঠোঙা, চূণকালির দাগ দেওয়ালে, মেঝেয় এবং ইতস্ততঃ। গুঁটিতিনেক ইঁট ছড়ানো বিক্ষিপ্তভাবে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ফড়ফড় করে কয়েকটা তেলাপোকা উড়ল, দৌড়াল। একটা চামচিকে চক্কর খেয়ে খেয়ে ঘুরতে লাগল ঘরে। আর ভেতর থেকে নাকজ্বলা এক বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধ উঠে এল।

সুষমা বেরিয়ে এল আগে। কমলাপতি তখন দাঁড়িয়ে ঠেলা থেকে মালপত্র নামানো তদারক করছেন।

'ঝাটা-টাটাগুলো আগে নামাও। ঘরের যা অবস্থা হয়ে রয়েছে, ইস!' সুষমা কমলাপতিকে বললেন।

'নামাচ্ছি নামাচ্ছি', কমলাপতি সুষমার কথার উত্তর দিয়ে ঠেলাঅলাদের তাড়া দিলেন, 'এই নিচে ওই যে সামনের দিকে ঝাটাফাটাগুলো আছে, ও-গুলো নামা আগে।'

'ওই জন্যেই তোমাকে বলেছিলাম সকালের দিকে আসতে। এখন এই বিকেল বেলায়...' সুষমার গলায় ঈষৎ ক্ষোভ অপ্রসন্নতা আর অভিযোগ।

'কী করে আসতে? বৃষ্টি হল না সকালে?' কমলাপতি সুষমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে মুখে চাপা এক বিরক্তি।

সুষমা আর কিছু বলল না। সবে এল উঠানের মধ্যে।

ননীবালা কি করবে ভাবছিল এতক্ষণ, এবার সরে এসে দাঁড়াল সুষমার কাছে। 'আপনারা একটু জিরিয়ে নিন, দিদি! আসুন, আমার ঘরে না-হয় একটু বসবেন।'

সন্ধ্যাকে এতক্ষণে দেখতে পেল ননীবালা। দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল প্রায়, কিন্তু এত লোকের সামনে কিছু আর বলল না। বরং অন্যরকম গলায় সন্ধ্যাকে ডাকল ননীবালা, 'ওদের নিয়ে একটু ঘবে বসা; এতদূর থেকে এল।'

'যাই', সন্ধ্যার বিস্ময়ের ভাবটা এতক্ষণে যেন কাটল। এতক্ষণে তারও খেয়াল হল বুঝি। নতুন ভাড়াটে এল, বাবার জানাচেনা লোক; সন্ধ্যাও শুনেছিল আগে। বাবার মুখে।

দুই

দিন দুই ভাল কেটেছিল, তিনদিনের দিন জ্বর হল কমলাপতির। দারুণ জ্বর। খুব শীত হল, থর থর করে কাঁপল সমস্ত গা ; দাঁতে দাঁতে অবিরাম খানিক ঠোকাঠুকির শব্দ আর কাঁপা কাঁপা গলায় কমলাপতির জড়িয়ে আসা অস্পষ্ট কথা। 'লেপ দাও, আরও একটা ; কম্বলটাও।...আর একটু চেপে ধর আমাকে।.. হ্যাঁ আরও জোরে।'

লেপ কম্বল কাঁথা দিয়ে জোরে চাপাচুপি দিয়ে বসেছিল সুষমা, তা সত্বেও ভয়ানক কাঁপতে লাগল কমলাপতির শরীর।

মাথার কাছে শিয়রের পাশে দাঁড়িয়েছিল পারুল। ম্লান বিষণ্ণতা এবং হতাশার ছায়া এই মেয়েটির মুখে। কেমন এক বেদনাও। কমলাপতি অস্থিরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে পারুলকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন, 'তুইও আয় পারু, আমার ওপরে উঠে চাপা দিয়ে বোস তো একটু।'

পারুল নড়ল না, দাঁড়িয়ে থাকল মুখে তেমনি বিমর্ষতা মেখে। সম্ভবত পারুল ঠিক ধরতে পারছিল না, বাবা কি বলছে।

চোখ কমলাপতির ছলছল করছে, জ্বালা করছে সম্ভবতঃ। কিংবা অন্য কোনো উপসর্গও হতে পারে। কমলাপতি আবার ডাকলেন, 'আয় আয়, এই আমার বুকের উপরে উঠে বোস।'

পারুল নড়ল না তবুও।

'ওকে আবার ডাকছ কেন ?' সুষমা আস্তে করে বলল। 'এমনিতেই ভয় পেয়েছে মেয়েটা।'

কমলাপতির শরীরের ওপর সামান্য ঝুঁকে পড়ে, লেপ

কম্বলসুদ্ধ তাকে দু'হাতে চেপে রয়েছে সুষমা। যতটুকু জোর দেওয়া সম্ভব ততটা জোর দিয়ে। 'তখনই মানা করেছিলাম তোমাকে, এই বয়েসে এত খাটনি…' সুষমা বলল কেমন এক অভিযোগের সুর গলায় এনে। কমলাপতির কাঁপুনির সঙ্গে তার গলার স্বরও সামান্য কাঁপল।

সেই অবস্থাতেই জ্বালা-করা অস্থির চোখে কমলাপতি সুষমাকে দেখলেন ; চোখ তুলে। এক বিষণ্ণ ছায়া, সম্ভবত তা ভয়—সুষমার চোখে মুখে। কি ভয়—কিসের—কমলাপতি ভাবতে চেষ্টা করলেন। আর ভাবতে গিয়ে পুরনো এবং বর্তমান অবস্থার কথা মনে পড়ে বোবা হয়ে গেলেন। সহসা কোনো জবাব দিলেন না।

শেষ বিকেলে জ্বর এসেছিল কাঁপিয়ে ; সেই কাঁপুনি থামতে থামতে রাত। এ-রকম জ্বর-জ্বালা কখনও হয় না কমলাপতির। হয়নি। অন্ততঃ বিয়ের পর থেকে সুষমা দেখতে পায়নি কোনোদিনই। তাই বলে যে একেবারে অসুখ বিসুখ হয় না কমলাপতির, তা নয়। পেটের গোলমালটা বরাবরই আছে ; দু' দিন ভাল যায় তো, তিন দিন ভুগে। খেতে পারে না। যা এক-আধটু খায় দায় তাও বাছাই করে করে।

সেই থেকে দু'জনের কথাই বন্ধ। সুষমা তেমনি চাপ দিয়ে কমলাপতিকে ভয়ানক শীত আর কাঁপুনি থেকে রক্ষা করতে চাইছিল। কমলাপতি কাঁপছিলেন এতক্ষণ, এখন কমে আসছে সেই কাঁপুনির ভাব। চাপ দেওয়া হাত দু'টো সামান্য আলগা করে বসেছে সুষমা। সুষমার ঘোমটা পড়ে গিয়েছে কখন। চোখে ভয়ানক এক শংকা এবং উদ্বেগ। আর ভীত ও বিমূঢ় ভাবটা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছিল না সুষমা।

সন্ধ্যা নামার পর এই ঘরে যে-টুকু শেষ আলো ছিল তাও

মুছল। পাতলা ফিকে অন্ধকারে ভাসল ঘরখানা। এই ছোট ঘর, তার স্তব্ধতা, থমথমে অসহায় রুদ্ধতা যেন অনুভব করতে পারছিল সুষমা। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল কখন।

সুষমার খেয়াল হল কমলাপতির গলা শুনে।

'একটু জল দাও আমাকে', কমলাপতি আস্তে, অনেকটা করুণ এবং বেদনার্ত গলায় বললেন।

'দিই।'

সুষমা উঠতে যাচ্ছিল, কমলা ঘরে ঢুকল। লণ্ঠনটা ধরিয়ে এনেছে কমলা। এই ছোট ঘরের স্তব্ধতা, অসহায় রুদ্ধতা আর গুমোট এবং ভয়ানক যে-অন্ধকার আস্তে গাঢ় হয়ে আসতে আসতে ভয়ানকভাবে জড়িয়ে ধরতে চাইছিল, হঠাৎ আলোয় সেই চাপ যেন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এতক্ষণে জোরে নিশ্বাস নিল সুষমা। শব্দ করে। যেন তার দমটা হঠাৎ আটকে গিয়েছিল বুকের সন্ধিতে, এখন সেই আটকানো দমটা মুক্তি পেল।

আলো দেখে সুষমা তাকাল। কমলাপতিও। যেন এই আলোর আশায় পথ চেয়ে ছিল ওরা, এতক্ষণে সেই আলো এলো ওদের ঘরে।

পুরনো রঙচটা, মরচের কলঙ্কধরা বড় একটা পোর্টমেন আছে, ঠিক কমলাপতির তক্তপোষের গা-বরাবর; দেওয়াল ঘেঁসে। কমলা লণ্ঠনটা রাখল সেখানে। সামান্য ঝুঁকে আলোর শিখাটা কমাল। নরম আলোয় ভরল এই ঘর। ···কমলা সরে এসে দাঁড়াল সুষমার কাছে।

'পারু কোথায় গেল রে?' সুষমা কমলাপতির কপালে আঙুল বুলোচ্ছিল, এবার কমলার দিকে তাকাল।

'রুমা বৌদির ঘরে বুঝি···' আস্তে করে বলল কমলা।

'ও ঘরে নেই?'

'না।'

'নীহারও গেছে?'

'হ্যাঁ, সন্ধ্যাদের ঘরে।'

আর প্রশ্ন না করে সুষমা থামল। কমলা দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

...বিকেলে হঠাৎ বাবার জ্বর এল কাঁপুনি দিয়ে, কমলা তখন এ-ঘরেই ছিল। ঘর গুছোচ্ছিল। ঝাড়টাড় পরিষ্কার করছিল। বাবা ও-ঘরে ছিলেন, কি অবিনাশ কাকার ঘরে তার সঙ্গে কথা বলছিলেন—ঠিক খেয়াল করেনি কমলা। বাবার তক্তপোষের বিছানাটা ঠিকঠাক করে কমলা ঘর ঝাড় দিল। তারপর ঘরটা আধাআধি মোছা হয়েছে কি কাঁপতে কাঁপতে এলেন কমলাপতি। 'খুব জ্বর এলরে আমার', প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তক্তপোষের ওপর শুয়ে পড়লেন। 'লেপটা বার কর তো কমলা' বিষণ্ণ কাঁপা ক্লান্ত গলায় বললেন কমলাপতি।

লেপ এ-ঘরে নেই, ও-ঘরে। কমলা হাতের কাজ রেখে উঠে এল তাড়াতাড়ি, সুষমাকে ডাকল, 'ওমা, মা—শিগগীর এসো,, জ্বর এল বাবার।'

সুষমা দুপুরের বাড়তি আমাজা বাসনগুলো ধুয়েটুয়ে সবে উনুনে হাত দিয়েছিল। এ-কাজটা তারই। শেষ দিকে, যখন কমলাপতি আর পারুলের খাওয়া শেষ হয় দুপুরের, তারপর দুই মেয়ে আর মা খেতে বসে একসঙ্গে। সে বাসনগুলো থাকে। বিকেলের দিকে সে-গুলো ধুয়ে মুছে নিয়ে তারপর উনুন নিয়ে বসে সুষমা। ছাই টাইগুলো ফেলে দিয়ে কয়লা ভেঙে উনুন সাজায়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আঁচ পড়ে না উনুনে। ঠিক সন্ধ্যা লাগার মুখোমুখি আঁচ দেয় সুষমা, তারপর বিকেলের ভাতটা ফুটিয়ে নিতে যা সময়। ডাল তরকারী একসঙ্গেই রান্না হয়। দুপুরে।

রাত্রিতে সে-গুলো শুধু একটু গরম করে নেওয়া। খাওয়া দাওয়ার পালাটা সারতে হয় সকাল সকাল। তার পেছনে কারণ আছে অনেক। সাতটা আটটার মধ্যেই সে-পাট চুকে যায়। না হলে কেরোসিন পোড়ে। খরচ বাড়ে এ-সংসারের।

মেয়ের কথা শুনে চমকে উঠল সুষমা। তাড়াতাড়ি উনুন ফেলে উঠে এল, 'কী বললি!' সুষমা শুনতে পেয়েছিল কথাটা তবু না শোনার ভাণ করল। ঠিক ভাণও নয়; সুষমা বুঝি শুনেও বিশ্বাস করতে চাইল না।···কপাল তো এমনিতেই পুড়েছে। পুড়ে পুড়ে আজ কোথায় এসে দাঁড়াতে হয়েছে। তার ওপর এই মানুষটার যদি ভালমন্দ কিছু হয়—সুষমা ভাবতে পারছিল না কথাটা।

'বাবার খুব জ্বর এল কাঁপুনি দিয়ে।' কমলার গলা সামান্য কাঁপল।

'জ্বর!' বিস্ময় অবিশ্বাস আর শংকা তিনে মিলে সুষমার গলায় কথাটা কেমন অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে ছোট আর্তনাদের মতই প্রকাশ পেল।

'হ্যাঁ, লেপ চাইছে বাবা।'

পরের কথাটা কানে গেল কি গেল না, সুষমা প্রায় ছুটে গেল কমলাপতির ঘরে।

কমলাপতি বিছানার এক-আধটু ছেঁড়া চাদরটাই তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে বালিশে মুখ গুঁজে হি-হি কাঁপছিলেন। ভয়ানক এবং অসহ্য শীতে হাঁটুমুড়ে, হাঁটুর ভাঁজে হাত গুঁজে কুঁকড়ে-মুকড়ে এতটুকু হয়ে সরে গিয়েছিলেন বিছানার এক কোণে। আর মুখে এক অদ্ভুত শব্দ তুলছিলেন।

'জ্বর এল তোমার?' সুষমা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিছানার ওপর।

'হ্যাঁ।' কমলাপতি না নড়ে, ঠিক তেমনি অবস্থায় বালিশে মুখ গুঁজে বললেন, 'লেপ টেপ কিছু দাও, বড় শীত।'

শীতের ভয়ঙ্কর কাঁপুনি কমে আসার পর এখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন কমলাপতি। যেন অসাধ্য, সাঙ্ঘাতিক রকমের কঠিন একটা পরিশ্রমের কাজ করবার পর শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে অবসাদে ধুঁকছেন। লণ্ঠনের অল্প আলোয় কমলা দেখতে পাচ্ছিল, বাবার চোখেমুখে এক অসহায় ভাব, করুণ এবং ক্লান্ত বিমর্ষতা। জ্বরের কাঁপুনির বিশ্রী ধকলটা পার হয়ে, এই বিছানায় এলিয়ে পড়েছে বাবা। তাকিয়ে আছে কমলার দিকেই। বাবার চোখের পাতা দু'টো যেন ভয়ানক নড়ছে। তক্তপোষের কোণের দিকে রাখা লণ্ঠনের সামান্য আলো পড়েছে বাবার চোখে মুখে গালে, বিছানার সঙ্গে বিছিয়ে দেওয়া হাতে; আর বুকে। বাবার গায়ে এখন লেপটেপ কিছু নেই।

নাকের একটা তির্যক ছায়া পড়েছে কমলাপতির গালের ওপর। কমলা দেখতে পাচ্ছিল। আর চোখ দু'টো এমন বসে গেছে, কী সাঙ্ঘাতিক রকমের যে, ঠেলে ওঠা প্রকট ভুরুর হাড়, তার লোম—সব কিছু উঁচু হয়ে আছে অনেকটা। সেই উঁচু ভুরুর ছায়া পড়ে অন্ধকার দেখাচ্ছে বাবার চোখ। ভয়ানকভাবে কোটরে বসে যাওয়া সেই চোখে, ভুরুর ছায়ার অন্ধকারে তাকানো চোখের মণি দু'টো যেন জ্বলছে। জ্বলছে জ্বলছে, নিভছে। চোখের পাতার পিটপিটানিতে সেই জ্বলা চোখে ছায়া পড়ছে, নিভছে, কমলার কেমন যেন ভয় লাগল।

কমলাপতির ঠোঁট দু'টো সামান্য নড়ল, কাঁপল চোখের পাতা। কমলার মনে হল বাবা কিছু বলবেন সম্ভবত।

'কিছু বলছ, বাবা ?' কমলা শান্ত স্থির গলায় শুধলো।

'একটু জল খাবো।' কমলাপতি জিভ বের করে নিচের ঠোঁটটা ভেজালেন।

'দিচ্ছি।'

কমলা সরে দাঁড়াবার আগেই সুষমা উঠল, 'থাক, তুই একটু বোস কুমু, আমিই নিয়ে আসছি।...কখন চেয়েছেন, ভুলেই গেলাম।'

সুষমা কুমু বলেই ডাকে কমলাকে। স্বামীর নামের নাম মেয়েটার, মেয়েদের মুখে স্বামীর নাম আনতে নেই। কমলার নাম নিয়ে একসময় তার আর কমলাপতির মধ্যে অনেক ঝগড়া হয়েছে। সে-সব বহুকাল আগে। কমলা যখন ভূমিষ্ঠ হল, তারও অনেক পরে, ওর অন্নপ্রাশনের আগে আগে।

সুষমার ইচ্ছে ছিল মেয়ের নাম হবে দু'অক্ষরে। উমা, সুধা, রমা, মঞ্জু কিংবা উষা টুষা। কমলাপতির ভিন্ন মত, 'না, আমার নাম দিয়ে ওর নাম হবে। হ্যাঁ, কমলাই।'

'কি যে বল,' সুষমা আপত্তি করেছিল, 'ওই নামে ডাকব নাকি আমি ?'

'কেন হয়েছে কী ?'

'তোমার নাম যে। ও-নাম মুখে আনতে নেই আমার।'

'ইস্, ও-সব বাজে ওজর। প্রেজুডিস। স্বামীর নাম বললে এমন কিছু অশুদ্ধ হবে না মহাভারত।'

'না, হবে না ; ও-আমি পারব না বাপু।'

'এ তোমার জেদ। আমার নামের জন্যেই শুধু নয়, অন্য কারণও আছে। ও আমার ঘরের লক্ষ্মী। কেমন দেখলে না, হল আর চট করে কেমন উন্নতি হল চাকরির ?'

সে-কথা সত্য। বিয়ের আগে থেকেই চাকরি করছিলেন

কমলাপতি। কর্পোরেশনে। উন্নতি হতে হতে কয়েক বছর। যে-বছর কমলা হল, সেই বছর।

শেষকালে একটা আপোষ মীমাংসায় এসেছিল ওরা। কমলাপতি বেঁকে বসেছিলেন, 'বেশ, তুমি যদি আমার নাম না বল, আমিও তোমাকে ডাকব না।'

সেই থেকে কমলাকে কুমু বলেই ডাকে সুষমা।

সুষমা চলে গেল। কমলা বাবার কাছে, তক্তপোষের কোণে বসবে কি বসবে না ভাবছিল; কমলাপতি ডাকলেন মৃদু গলায়।

কমলা তক্তপোষে বসল, 'গায়ের লেপটেপ ফেলে দিয়েছ কেন?'

'গরম লাগছে ভয়ানক।'

'কিন্তু টেম্পারেচার যে বাড়ছে,' কমলার গলায় সামান্য অভিযোগের সুর। 'এই কাঁথাটা না হয়...,' কমলা পায়ের দিক থেকে একটা কাঁথা টানল, 'গায়ে দিয়ে দেব, বাবা?'

'দাও।'

'বাতাস করব তোমাকে?'

'থাক, টেম্পারেচারটা বাড়ছে...'

কমলা আর কিছু বলল না; চুপচাপ বসে রইল পোর্ট-মেনের ওপরে রাখা মৃদু-আলো লণ্ঠনটার দিকে তাকিয়ে।

'অবিনাশ ফিরেছে জানিস?'

'দেখিনি।'

'এলে একবার ডাকিস তো। বলবি বাবা ডাকছে।'

'আচ্ছা।'

বাবার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে যেমন অবাক লাগে, এক ধরনের দুঃখ আর বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয় তেমনি;

আজও তাই মনে হচ্ছিল কমলার। সেই দুঃখ বেদনা আর জ্বালার শিখাটা মনের কোন অদৃশ্য জায়গায় জ্বলে উঠল—বুঝতে পারল না, ধরতে পারল না কমলা। কিন্তু অনুভব করতে পারল ঠিক। আর সেই সঙ্গে কণ্ঠার কাছে দলা পাকানো এক করুণ কান্না নড়ছে, নড়ছে, নড়ছে।

…মানুষের ভাগ্য বুঝি এমনই। আমাদেরও তাই। কমলা বাবার বিছানায় বসে পোর্টমেনের ওপরে রাখা লণ্ঠনটার দিকে তাকিয়ে ভাবল।…আজ আমরা এই আছি, কালও থাকব হয়তো, থাকতে পারি—কিন্তু পরশু দিনের খবর আমরা জানি না। কাল কি পরশু কিংবা তারপর, কখন যে কি হবে আমাদের, তা জানি না, জানবার উপায় নেই, ধরতে পারি না, ভাবতেও নয়। তা যদি পারতাম, তা হলে আজকের কথা অজানা থাকত না আমাদের কাছে…কমলার ভাবনাটা লণ্ঠনের আলোর শিস ছুঁয়ে পেছনে ছুটতে লাগল। তেমন পুরনো নয়, ক-দিনেরই বা কথা। একটুও অস্পষ্ট কি ঝাপসা হয়নি।

কমলাপতির চাকরি গিয়েছিল, সে-কথা ওরা কেউ জানত না। কমলা, নীহার কি পারুল—ওদের কেউ নয়। সুষমা জানত। কমলাপতিই বলেছিলেন তাকে।

বরাবর সন্ধ্যা ছ'টা, বড় জোর সাড়ে ছ'টার মধ্যে কমলাপতি অফিস থেকে ফিরতেন। আর রোজ, প্রত্যহ ঠিক ফটকের সামনে এসে পারুলকে ডাকতেন জোরে জোরে। বিস্কুট, বাদামভাজা কি মরশুমী ফলফলানি—একটা কিছু হাতে থাকত তাঁর। কিনে আনতেন কমলাপতি। পরিমাণে কি সংখ্যায় কোনোটাই কম থাকত না। পারুলের নাম করে যা আসত, তা সকলে মিলে খেয়েও যেন ফুরোতে চাইত না।

বাড়ি ঢুকে কমলাপতি জামা-কাপড় ছাড়তেন, ধুতেন

হাত মুখ, তারপর একপ্রস্থ চা-জলখাবার নিয়ে সুষমা এসে দাঁড়াত পাশে।

বড় মেয়েরাও আসত। বসত কমলাপতির কাছে। অবশ্য সিনেমা থিয়েটার কি বেড়াতে টেড়াতে না গেলে।

রামরতন বোস লেনের সেই সন্ধ্যাটুকু অদ্ভুত এবং আশ্চর্য আনন্দে ভরে থাকত। হাত মুখ ধুয়ে এসে ইজিচেয়ারে বসবার আগে কমলাপতি নিজেও রেডিওটা খুলে দিতেন, কখনও কখনও সুষমা কি মেয়েরা। অল্প ভল্যুমে রেডিওতে গান কিংবা বাজনা টাজনা হত। খবর বলত রেডিওতে। আর ঘরে স্বামী স্ত্রী মেয়েরা মিলে চা-জলখাবার খেতে খেতে গল্পে মাততেন।

এই ধরাবাঁধা নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম হল সে-দিন। যে-দিন চাকরি যাওয়ার খবর নিয়ে কমলাপতি বাড়ি এলেন।

হাতে সে-দিন সন্দেশই ছিল কমলাপতির। প্রথমটা কিছু আনতেই ভুলে গিয়েছিলেন। এতবড় একটা দুঃসংবাদ, হঠাৎ রুজি রোজগারের পথ বন্ধ, মাথার কিছু ঠিক ছিল না। অফিস ছুটির পর উদ্দেশ্যহীনভাবে এলোমেলো ঘুরেছিলেন রাস্তায়। অন্যমনস্ক মন নিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে অবসাদে প্রায় টলতে টলতে বাড়ি ঢুকবার মুখে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল তাঁর। হাত খালি কমলাপতির। সামান্য চমকালেন যেন, দাঁড়ালেন এক মুহূর্ত। তারপর বাড়ি না ঢুকে ফিরে গেলেন রাস্তায়।

বেশি দূরে না গিয়ে কাছের এক দোকান থেকেই আধ সের সন্দেশ কিনে ফেললেন কমলাপতি। অন্ততঃ মেয়েরা যাতে ধরতে না পারে, বিপদ আপদ কিছু একটা ঘটে গেছে আজ। সন্দেশ কিনে কমলাপতি নিজেকে তৈরি করলেন। ক্লান্ত আর অবসাদের ভাবটুকু শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে

স্বাভাবিক হবার মহড়া দিলেন নিজে নিজেই। তারপর ঠিক ফটকের কাছে এসে দাঁড়ালেন থমকে। দাঁড়িয়ে গেলেন। মনে হল, কোথায় যেন একটু ভুল হচ্ছে তার! পা-দুটো পড়ছে না স্বাভাবিকভাবে। সন্দেশের বাক্সটা জোরে চেপে ধরে পারুলকে ডাকলেন কমলাপতি। জোর গলায়, রোজকার মত। কিন্তু নিজের গলার স্বরটুকু পর্যন্ত নিজের কাছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক আর বেখাপ্পা মনে হল কমলাপতির কাছে। কেমন অদ্ভুতভাবে কাঁপল গলার স্বর ; কমলাপতি নিজের গলার স্বর শুনে ভয় পেলেন নিজেই।

পারুল শুনতে পেয়েছিল ঠিক। শুধু পারুল কেন, এ-বাড়ির সকলেই। সুষমা, কমলা আর নীহারও। আসলে সাড়ে ছ-টার পর থেকে এ-বাসার প্রত্যেকটা মানুষই উৎকর্ণ হয়েছিল ওই ডাকটুকু শোনবার জন্য।

সুষমা ভেবেছিল, বিপদ আপদ একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। যে-লোকটা বরাবর ছ-টায় বাড়ি ফেরে, ক্বচিৎ কদাচিৎ বড়জোর সাড়ে ছ-টা ; আজ সাতটার মধ্যেও সেই মানুষটা ফিরল না কেন? সুষমা খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল। ঘরবার করছিল ; বসছিল মেয়েদের কাছে—আবার উঠে উঠে বারান্দায় এসে তাকাচ্ছিল রাস্তার দিকে। নিজের এই অস্থিরতাটুকু যেন গোপনীয়। মেয়েরা জানতে না পারে, বুঝতে না পারে—সে-জন্য সতর্ক থাকা সত্বেও মাঝে মাঝে তার অস্থির ভাবটা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিল মেয়েদের কাছে।

একধরনের ভয় আর সংশয়ই জেগেছিল সুষমার মনে। এতক্ষণে কমলাপতির গলা শুনে নিশ্চিন্ত হতে পারার কথা তার। তবু মনের কুভাবনাটা দূর করতে পারল না সুষমা। কমলাপতির গলা শুনে পারুল দৌড়ে নিচে নামল। সুষমা

বড় ছু' মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ওদের কথাটা ধরতে চাইল বুঝি। তারপর কমলাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কুমু, রান্না ঘরে যা-তো একবারটি। লেচি পাকানোই আছে, চট্-পট্ একটু বেলে দিবি, যা। আমি এসে ঘি চড়াব।'

মেয়েকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল সুষমা।

বাড়ি ফিরবার পর থেকে সারাক্ষণ প্রায় ঝিম ধরেই রইলেন কমলাপতি। খুব স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু হতে পারেননি। খাবার খেতে পারলেন না। নীহার খুলে দিয়েছিল রেডিওটা, কমলাপতি বিরক্ত হওয়াতে রেডিও বন্ধ হল। ঘরের আলোটা পর্যন্ত নিভিয়ে দিতে বললেন কমলাপতি।

খুব অবাক হয়েই আলোটা নেভাতে গিয়েছিল সুষমা, কমলাপতি ইজিচেয়ার থেকে মাথাটা সামান্য তুলে সুষমার দিকে তাকালেন। 'থাক, একদম অন্ধকার না করে বরং বেড-সুইচটা টেপ। নীল আলোটা জ্বলুক।'

বেডসুইচ টিপল সুষমা। আগে। এতক্ষণের ষাট পাওয়ারের বাল্‌বের উজ্জ্বল আলোয় নীলচে একটা ভাব ফুটল। খুব হালকা নীল, ধরা যায় কি যায় না। যেন অল্প মালিন্যে ঘরের উজ্জ্বল আলোর রঙ পালটালো।

ষাট পাওয়ারের বাল্‌বটা এবার নেভাল সুষমা।

'তোমার কি শরীর টরীর খারাপ হল?' সুষমা কমলা-পতির ইজিচেয়ারের কাছে সরে এল।

কমলাপতি নড়লেন না। কথাও বললেন না।

'অসুখ বিসুখ কিছু...', সুষমা কমলাপতির কনুই-চাপা কপালের অল্প অংশ ছুঁল।

'না।'

'তা হলে···

'এমনি।' কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না কমলাপতির, তবু বললেন, 'মনটা ভাল নেই তেমন।'

'কেন, কী হল আবার?' সুষমা ঘন হয়ে সরে আসতে চাইল।

'কিছু না।' কমলাপতির গলায় অল্প বিরক্তির আভাষ ফুটল।

সুষমা আর কিছুই বলল না। খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সরে গেল।

রাত্রিতে শুতে এসে সে-দিন কমলাপতি সুষমাকে আসল সংবাদটা জানিয়েছিলেন। চাকরী যাওয়ার সংবাদ।

কর্পোরেশনে মোটামুটি ভাল চাকরি করতেন কমলাপতি। মাস গেলে মাইনে পেতেন মোটা। থাকতেনও তেমনি। রামরতন বোস লেনে গোটা একটা দোতলা বাড়ীই ভাড়া নিয়েছিলেন। খাওয়া-দাওয়া আসবাবপত্র চাল-চলনে এ-বাড়ির একটা বিশিষ্ট সম্মান ছিল পাড়ায়। একটামাত্র দোষ ছিল কমলাপতির, সেটা বেহিসেবী মানুষ বলে। যা পেতেন, প্রায় তাই খরচ হত। জমত না তেমন কিছু। এই নিয়ে সুষমা অনেকবার সাবধান করেছে, কিন্তু কমলাপতি সে-কথা শোনেননি।

চাকরি যাওয়ার পর প্রথম ক' দিন দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মান, এক অসম্ভব গম্ভীরতা আর বিষণ্ণতা নিয়ে কাটল। কমলাপতি নিজে যেমন বিশ্বাস করতেন, তেমনি সুষমারও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—আবার চাকরী হবে কমলাপতির। হবেই। কিন্তু মাস কাটল, একে একে চারটা পাঁচটা মাস পার হয়ে গেল, এই হচ্ছে এই হচ্ছে করেও সব চাকরি ফসকে গেল হাত থেকে। হল না।

মেয়েদের কাছে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন কমলাপতি, ধরাও পড়ে গেলেন একদিন। বাড়িঅলা দু'তিন বার ফিরে গিয়েছিল আগে, শেষ পর্যন্ত দু'টো শক্ত কথাই বলে গেল উঠানে দাঁড়িয়ে। যে-কথা মেয়েদের কান থেকে আড়াল করতে পারেননি কমলাপতি। জোর করে চাপা দিতে পারেননি মেয়েদের চোখ।

সামান্য যা কিছু ছিল হাতে, তা শেষ হল ; হাত পড়ল প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায়।

সুষমা বলল, 'বাড়ি ছেড়ে দাও, অল্প ভাড়ায় যদি কোনো...' এই পর্যন্তই বলেছিল সুষমা। পরেরটুকু আর বলতে পারেনি।

সুষমা জলের গ্লাশ নিয়ে এল।

কমলাপতি ঢকঢক করে সবটুকু জলই খেয়ে ফেললেন গ্লাশের।

হঠাৎ তেল উঠে গিয়ে কি অন্য কোনো কারনে লণ্ঠনের আলোর শিখাটা জোরে জ্বলল। হলদেটে অর্ধবৃত্ত আলোর সীমানা ছাড়িয়ে খানিক লালচে মেশানো হলদে, তারপর কালো। আলোর একটা কোণ উঁচু হয়ে কালি জমছে চিমনিতে। ওপরটা প্রায় কালো হয়ে এল। থেকে থেকে দপ্ দপ্ করছিল শিসটা। সুষমা জলের গ্লাসটা মেঝেয় রেখে আলো কমাল।

কমলা চলে যাচ্ছিল, সুষমা ডাকল, 'নীহার কোথায় গেল রে কুমু ?'

'কেন, সন্ধ্যাদের ঘরে নেই ?'

'কি জানি, গলা তো শুনতে পাচ্ছি না।'

'তা হলে রুমা বৌদির ঘরে।'

'ওকে ডাক একবার। রাত হল, উনুনে পর্যন্ত আঁচ পড়ল না।'

'উনুন ধরাচ্ছি আমি।' কমলা বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বারান্দা ছাড়িয়ে উঠানে নামল কমলা।···সন্ধ্যাদের ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভেতরে সামান্য আলো। কুপি জ্বলছে কপাটের পাল্লার আড়ালে। আলোর কাছাকাছি একজন মানুষকেও দেখতে পেল কমলা। সন্ধ্যার মা। পিঠে কাপড় নেই সন্ধ্যার মা-র। আলগা। সামান্য ঝুঁকে পড়ে কি যেন করছে ননীবালা, কমলা দেখতে পেল।

উনুনে আঁচ দিতেই এসেছিল কমলা, বাবার কথাটা মনে পড়ল তখন। কমলা ছোট উঠানটুকু পার হয়ে সন্ধ্যাদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

'অবিনাশকাকা এসেছে, খুড়িমা?'

ননীবালা কপাটের পাল্লার আড়ালে বাতাসের হাত থেকে গোপন করে রাখা কুপির আলোয় শাড়ির খানিকটা ছেঁড়া অংশ সেলাই করছিল। পরশু দিন এই কাণ্ডটি ঘটেছে। এমনিতেই বায়ু-চড়ার রোগ আছে, তার ওপর গরম। ভয়ানক গুমোট গরম পড়ছে আজকাল। গা-গতর ঘেমেঘুমে যেন নেয়ে ওঠে। এই গরমে কি হদিশ ফদিশের বালাই থাকে মানুষের? না, সাবধান-সতর্ক থাকা যায়। ঘামে ঘামে বুঝি ভিজেছিল শাড়িটা, দুপুরে একটু আলগাভাবে বসতে গিয়ে পাছার কাছটা পড়পড় করে ছিঁড়ে গেল।

মানুষের যখন দুঃসময় শুরু হয়, তখন এমনিই সব ক্ষতির পালা আসে একের পর এক। একে শাড়িটাড়ি বড় একটা নেই ননীবালার। নিজের খান দুই, আর মেয়ের যা আছে তাই বদলে টদলে চলে যাচ্ছিল কোনোরকমে। ছিঁড় তো

ছিঁড়, ঠিক এই সময়েই গেল শাড়িখানা। রোজই সেলাই করার কথা ভাবে ননীবালা কিন্তু হয়ে আর ওঠে না। তুপুরে হয় না। নিজের গতর নিয়েই জ্বালায় মরে ননীবালা, তার ওপর আবার সেলাই! আর ভগবানও তেমনি, বয়সকালে গায়ে মাংস ধরল না, সুখের কালটা গেল, এখন বয়েস হয়েছে—এখন গায়ে-গতরে মাংস বাড়ছে তো বাড়ছেই। সন্ধ্যার সময় পর্যন্ত ননীবালা ঝিমোয়। তুপুরের গরমে ঘুমোবার জো নেই, সন্ধ্যার দিকে একটু ঠাণ্ডাটাণ্ডা পড়লে, বাতাস ছাড়লে শরীরটা জুড়োতে থাকে। তারপর আর হয়ে ওঠে না। এই করেই কাটল তু'দিন।

আজ চাড় পড়েছে। তাও পড়ত না যদি মেয়ের সঙ্গে খানিকটা না হত।

সন্ধ্যা পছন্দ করে না তার শাড়ি কি জামাটামা ননীবালা পরুক। মায়ের তুলনায় মেয়ে অনেক কৃশ, তার জামা কি সায়া কোনোটাই ননীবালার গায়ে লাগে না। জামাটামা-গুলো বড় একটা পরে না ননীবালা। পর পর বার-কতক পরতে গিয়ে শিক্ষা হয়েছে তার। গায়ে গলে না জামা, তবু জোর জবরদস্তি করতে গিয়ে ছিঁড়ে, ফেঁসে গেছে। সায়াটা মাঝেসাঝে পরে। তাও ছাই সে-সায়া পরে যখন তখন আরাম করে বসবার উপায় নেই। বসতে গেলে টান পড়ে পাছায়। মেয়ের আবাব সে-সবের চিহ্ন নেই। তাই সায়ার ঘেরগুলো বড় ছোট। ছোট ছোট আঁট আঁট লাগে ননীবালার।

শাড়িটা ননীবালা পরে। মেয়ে আপত্তি করে, ঝগড়া করে কিন্তু উপায় কি? এমন তু'একখানা বাড়তি টাড়তিও নেই যে, তাই পরবে। মায়ের তুলনায় মেয়ের শাড়ির সংখ্যা বেশি, তাই না মাঝে সাঝে টান দেয় তার তু'একখানা ধরে।

বিকেলেই একচোট হয়ে গিয়েছে এই নিয়ে মেয়ের সঙ্গে।

শেষকালে রাগে দুঃখে অভিমানে নিজের ছেঁড়া শাড়িটা নিয়ে পরেছে ননীবালা। সত্যি কেটেছে ননীবালা, প্রতিজ্ঞা করেছে। না, কিছুতেই আর মেয়ের জিনিসে হাত দেবে না।

কুপিটা কপাটের আড়ালে রেখেছে ননীবালা, পাছে হাওয়ার দাপট টাপট এসে হঠাৎ নিভে টিভে না যায়। হাওয়া অবশ্য আসছে না এখন জোরে। সারাদিনের গুমোট গরমের পর একটু হাওয়া ছেড়েছে! ননীবালা তাই পিঠের কাপড়টুকু সরিয়ে পিঠ আলগা করে বসেছে কাজ করতে।

কথাটা শুনতে পেয়েছিল ননীবালা। কিন্তু গলার স্বরটা ঠিক ধরতে না পেরে চমকে তাকাল হাতের কাজ বন্ধ করে। কমলাকে দেখতে পেল ননীবালা।

'কাকা ফেরেনি?' দরজার কাছে সরে এসে শুধলো কমলা।

'না, রাত হবে ফিরতে। কেন, দরকার আছে?'

'না, বাবা খবর নিতে বলছিলেন।'

'আচ্ছা, এলে বলব। ডাকছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

সুতো-পরানো সূচটা কাপড়ে গেঁথে রাখল ননীবালা। তারপর ডানহাতে মেঝেয় ভর করে গতর নাড়লো, কাৎ হল সামান্য—অনেক কষ্ট করে উঠেও দাঁড়াল।

'কেমন আছেন তোমার বাবা?'

'শীত কমেছে। টেমপারেচার বাড়ছে এখন।'

'তাই তো।' ননীবালা জিভ আর তালু দিয়ে অদ্ভুত এক শব্দ করল। 'কি বিপদের কথা বল তো।…'

ফিরে এসে উনুন ধরাতে বসল কমলা।

সন্ধ্যা সামান্য ঘন হয়ে এল কি এ-বাড়ির সমস্ত কলরোল

থেমে এল। বিকেল শেষ হয়ে গেলে গুটি-পাঁচেক উনুন ধরে এ-বাড়িতে, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় এ-বাড়ির মাথার ওপরের আকাশটুকু পর্যন্ত ঝাপসা দেখায়। কালো ধোঁয়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে যায় আকাশ। একটু যদি হাওয়া টাওয়া উঠল এই রাশ রাশ কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দরজা জানলা দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে. দম বন্ধ হয়ে আসে। ভয়ানক বিশ্রী লাগে কমলার। তবু চুপচাপ থাকে। নাক বন্ধ করে কোনো সময় কিংবা চোখের জল মোছে আঁচলে, মুখে বলে না কিছু। নীহার কিন্তু রেগেমেগে অস্থির। একেবারে সহ্যশক্তি নেই নীহারের। বুঝালে বুঝবে না, বিরক্তি কি বিশ্রী লাগলে মুখ বন্ধ করে থাকবে না নীহার। কথা শোনাবে : দুপদাপ শব্দ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে।

নীহারকে নিয়ে যত ভয় সুষমা আর কমলার। অনেক দিন বোঝাতে চেয়েছে কমলা···বাবার চাকরি নেই, টাকা পয়সা বলতে এক আধলা আয় নেই বাবার, অথচ আমরা পাঁচ পাঁচটি প্রাণী সংসারে। আমাদের খাওয়া দাওয়া আছে, কাপড় পরা আছে—আরও কত কী যে খরচ! বাবার হাতে কিছুই নেই। কিন্তু নীহার বুঝবে না, স্থির হয়ে শুনবে না কোনো কথা।

বাবা-মার আদর পেয়ে, প্রশ্রয় পেয়ে নীহার এতটা বেড়েছে। কমলা নীহারের প্রতি মনের ক্ষোভ দূর করবার জন্য নিজের মনকে বলছিল। দোষটা আর নীহারের কি, সবই আমাদের ভাগ্য। বরাত। ভাগ্যে আমাদের আরও কত কী যে আছে······মাথাটা হঠাৎ ঝিম ঝিম করে উঠল কমলার।

রুমা বৌদিদের ঘর থেকে কথা ভেসে আসছে, শুনতে পেল কমলা। সন্ধ্যার গলা, নীহারেরও।

সামান্য একটু আলো ছিল এতক্ষণ, আস্তে অন্ধকারের এক ছায়া এসে এই আলো মুছল। আকাশে চাঁদ উঠছিল বুঝি। সবেমাত্র প্রকাশ পাওয়া চাঁদের আলো ; তাও মুছল। কমলা আকাশে তাকাল।···মেঘ। আকাশে মেঘ উড়ছে। কালো ময়লা মলিন পুরনো নোংরা তূলোর মত পেজা পেজা মেঘ। সেই মেঘে চাঁদ ঢাকল। অল্প আলোটুকু পর্যন্ত নিভল। উত্তরের ঠাণ্ডা এক পশলা হাওয়া লাগল কমলার গা-য়ে।

ঘুঁটে ভেঙে উনুন সাজাল কমলা। তারপর খুব সাবধান এবং সতর্কভাবে গুলগুলো সাজাল। বিকেলে শুধু ভাতটাই রান্না করতে হয়, কয়লার দরকার করে না। ডাল তরকারি যা রান্নার, তা তুপুরেই রান্না করা থাকে। ভাত নামিয়ে তুপুরের ডাল তরকারি একটু গরম করে নিলেই হয়ে গেল। তা-ছাড়া কয়লার যা দাম, জোগাড় হয় না ; বেহিসাবীর মত কি করে কয়লা পোড়াবে···

কেরোসিনের বোতলটা খুঁজছিল কমলা। পেল অনেক পরে। কিন্তু একফোঁটা কেরোসিনও নেই বোতলে।···এখন কি করি, কি দিয়েই বা ধরাই উনুন। কমলা উঠল।

বারান্দায় সন্ধ্যার মা-র সঙ্গে কথা বলছিল সুষমা। কমলাকে দেখে কথা থামল ওদের। সুষমা মেয়ের দিকে তাকাল।

'কেরোসিন নেই মা ?' কমলা শুধলো আস্তে গলায়।

'বোতলে দেখ না।'

'দেখেছি, নেই।'

'তা হলে কাগজ টাগজ দিয়ে ধরা না হয়।'

বিরক্তি অনুভব করল কমলা। কয়লার কাজ গুল দিয়ে চলে, চালানো যায় কোনোরকমে। কিন্তু কাগজ দিয়ে উনুন

ধরানো সত্যিই কষ্টের। তা-ছাড়া কোনোদিন এমনি করে উনুন ধরায়নি কমলা।

'কাগজ দিয়ে ধরাতে আমি পারব না'; কমলার গলায় ঈষৎ ক্ষোভ এবং অল্প বিরক্তি।

'কেন?'

'না।'

'না পারার কিছু নেই। তুই বরং…'

'তা হলে তুমিই ধরাও।'

মুখ তুলে একমুহূর্ত মেয়ের দিকে তাকাল সুষমা। কমলার গলার এই প্রতিবাদ অবাধ্যতা এবং অবজ্ঞা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। বিশ্বাস করাও যায় না। এই মেয়েই সুষমার যা কিছু ভরসা। কাজে কর্মে যখন যে-কথাটি বলুক, কমলা তা করে যায় নির্বিবাদে। সেই মেয়ের গলার স্বর আজ অন্য। কেন অন্য, কেন…ভাবতে গিয়ে সুষমা থামল…'যাক আমিই ধরাবক্ষণ। তুই উঠে আয়।'

তিন

'পিসিমারা কেমন আছেরে ?'

মেঝেয় পাতা মাতুরের ওপর আরশীখানা ঠিকমত বসিয়ে চিরুণি হাতে চোখ তুলে তাকাল কমলা, শুধলো আস্তে গলায়।

তক্তপোষের ওপর বসে তু' হাতে তক্তার প্রান্ত ধরে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে ন্যুব্জ ভঙ্গিতে বসে ছিল সনৎ, এবার হাত তু'টো তুলে এনে সোজা হয়ে বসল।

'ভাল নেই,' ঠোঁট উলটে হতাশার সুরে বলল সনৎ। তারপর চোখ কুঁচকে অনেকটা বিরক্ত হওয়ার ভঙ্গিতে দরজা ডিঙ্গিয়ে তাকাল উঠোনে।

উঠোনে সুষমা উনুনে আঁচ দেবার জোগাড় করছে। ও-বেলার ছাইটাই ঝেড়েপুছে এখন কয়লা সাজাচ্ছে।

বরাবর এ-বাড়ির সকলের পরে উনুন ধরে সুষমাদের। ঠিক সন্ধ্যেটা লাগব লাগব সময়ে। ততক্ষণে এ-বাড়ির যারা বাসিন্দে তাদের ভাত নামাবার সময় হয়।

আজ এত শিগগীর, সন্ধ্যার অনেক আগে ব্যস্ত হওয়ার কারণটা অন্য।

সনৎ এল ঠিক তুপুর গড়াল যখন। সঙ্গে আবার নিখিলও এসেছে। সনতের বন্ধু নিখিল। নিখিল যে সুষমাদের বাসায় এই নতুন এল, এমন নয়। এর আগে শ্যামবাজারের বাসাতেও অনেকবারই এসেছে। বলতে গেলে প্রায় সনতের মতই আপন হয়ে গেছে ছেলেটি। হাজার হলেও এতদিনের জানাশোনা···। তবে এ-বাসায় এই ওরা প্রথম। শ্যামবাজারের বাসা ছেড়ে আসবার পর কোনো আত্মীয় স্বজনই আসেনি এখানে।

আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই বা এমন কে আছে যে খোঁজখবর করবে। কেউ নেই তেমন। একমাত্র আত্মীয় বলতে নির্মলা, কমলাপতির পিঠের বোন—তা সেও যখন তখন যে খোঁজখবর নেবে তার জো নেই। তারও সংসার আছে; সে ঝক্কি-ঝামেলা পুইয়ে সময় আর হয়ে ওঠে না।

শ্যামবাজারের বাসায় থাকতে তবু বন্ধের দিন টিন হলে সনৎকে নিয়ে চলে আসত নির্মলা। মাঝে মাঝে মনমোহনকে নিয়েও। মনমোহন নির্মলার স্বামী।

তখন খুব একটা অসুবিধে ছিল না। দুর্গা পিতুরী লেন থেকে শ্যামবাজারে আসা এমন দু' দশ ঘণ্টা সময়ের দরকার পড়ত না। অনায়াসেই যাওয়া আসা করা যেত। ওরা যদি এক সপ্তাহে না আসত তো, মেয়েরা যেত। বিশেষ করে নীহার। পিসি বলতে নীহার যেমন অজ্ঞান, যেন পিসি ছাড়া আপন কেউ নেই ওর, তেমনি নির্মলাও নীহারকে ভালবাসে। নির্মলা বলে, 'তোমার মেজ মেয়ে বৌদি, আমাদের মা-র মুখ পেয়েছে।'

এখানে, এই রাখহরি দাস লেনের বাসায় এই প্রথম এল ওরা। সনৎ আর নিখিল।

সুষমা বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি ওদের কাছে। দাঁড়াতে পারেনি। হতাশা মেশানো এক সংকোচ সুষমাকে তাড়া করছিল। সুষমা জানে, ওরা দুঃখ পাচ্ছে এই অবস্থা দেখে। আর ওদের মুখের ওপর পড়া দুঃখের সেই অভিব্যক্তি কি ছায়া কোনোটাই সইতে পারবে না সুষমা।

তবু হেসেছিল সুষমা। চেষ্টার, কষ্টের হাসি, 'এতদিনে মামীর কথা মনে পড়ল বুঝি ?'

সনৎ মাথা নিচু করে সুষমার পায়ের ধুলো নিল। নিখিলও। সুষমা সস্নেহে মৃদু কাঁপা হাতে ওদের মাথা ছুঁলেন।

'এমন জায়গায় বাসা নিয়েছ মামী,' সনৎ আলকাতরায় রঙ করা ক্যানেস্তারা টিনে ছাওয়া বারান্দার দিকে তাকাল, 'খুঁজতে একেবারে জান পয়মাল।'

'কষ্ট হয়েছে, না-রে ?' সুষমা আঁচলে গলার ঘাম মুছতে মুছতে সনৎ আর নিখিল দু'জনের মুখের দিকেই তাকাল।

নিখিল এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। শান্ত ভঙ্গিতে।

কমলা বেরিয়ে এসেছিল আগেই, নীহার এল খানিক পরে। ঘুমচোখ মুছতে মুছতে।

'তাও কি খুঁজে পাই নাকি ?' সনৎ নীহার আর নিখিলের মুখ দেখল, তারপর স্মিত একটু হেসে চোখ ফেরাল সুষমার দিকে, 'কণ্ডাক্টরকে বললাম, তা সে-ব্যাটাও চেনে না। নামিয়ে দিলে বিবির হাট না কোথায়। যা শালা···,' হঠাৎ লজ্জা পেল সনৎ কথাটা বলে। আসলে মুখ ফসকে কখন যে সাধারণ কথার মত এই সব বিশেষ কথাগুলো বেরিয়ে যায়—খেয়ালই থাকে না। কথা থেমে যেতে অত্যন্ত অপ্রস্তুতের মত হেসে উঠল সনৎ। এবং তাড়াতাড়ি তার অপ্রস্তুত আর বিব্রতভাবটাকে চাপা দেবার জন্য বলল, 'শেষকালে বুঝলে মামী, জিজ্ঞাসা করতে করতে স্রেফ পায়দল।'

'ওরা সব ভাল ?' সুষমা একবার নীহার আর একবার নিখিলের মুখ দেখে সনতের দিকে তাকাল।

'সে সব আছে মামী। মা-র তো বারোমেসে, সে আর সারবার নামটি নেই।'

'থাক, এবার ঘরে গিয়ে একটু বোস। জিরিয়ে নে।' সুষমা সরে পড়ল সাত তাড়াতাড়ি।

এই এল ওরা। এত তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত হল না যদিও, তবু সুষমা ওদের ঘরে পাঠিয়ে কাজে মন দিল। ভদ্রতা

বলে কথা আছে একটা। একটু চা, সঙ্গে সামান্য হালুয়া টালুয়াটাও ধরে দিতে হবে অন্তত।

টানা বারান্দার এ-কোণ থেকে ও-কোণ ঘুরে গোটা বাড়িটাই মোটামুটি দেখল ওরা। সনৎ আর নিখিল। তারপর কমলাদের ছ'টো ঘরই। দেখা শেষ করে, সকলে কমলাপতির ঘরটাতেই বসল।

যতক্ষণ কমলাপতি না থাকেন নীহার এই ঘরটা কিছুতেই ছাড়তে চায় না। কেন যে এ-ঘর এত ভাল লাগে ওর, ভগবান জানেন! কমলাপতির তক্তপোষে শুয়ে গড়িয়ে সময় কাটে নীহারের। একটা কাজে কর্মে দিলে নানান বাহানা। পেট কনকন করছে, শরীরটা ভয়ানক খারাপ কিংবা মাথাটা এমন ধরেছে যে—চট করে মুখের ওপর অজুহাত দেখাতে সময় লাগে না নীহারের। কিন্তু কমলাপতি এলেন কি ঘর ছেড়ে সুড়সুড় করে সরে পড়ল নীহার। তখন দক্ষিণের ঘরটা চাই।

এ-ঘরে এসে সকলে বসল। ছ' একটা কথা হতে হতেই নীহার কেটে পড়ল। তার খানিকবাদে কিছুক্ষণ উসখুস করল নিখিল, ঘন ঘন তাকাল দরজায়, তারপর এক সময় নিখিলও উঠল। বাইরে গেল। বারান্দায়।

নিখিলকে বেরিয়ে যেতে দেখে অল্প হাসল কমলা। এমনিতে উঠে যাবার ছেলে নয় নিখিল। নিশ্চয়ই বারান্দা থেকে ইশারা করেছে নীহার, ডেকেছে। এবং ওরা বারান্দাতেও থাকবে না কমলা জানে। পাশের ঘরেই যাবে ওরা। ও-ঘরে এখন মা নেই। ঘরটা খালি। তবু খানিক গল্প করতে টরতে পারবে।

মেঝেতে মাছুর পাতল কমলা। তারপর বাবার আরশি-খানা টেনে এনে চুল আচড়াতে বসল মাছুরের ওপর।

পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দেশলাইয়ে ঠুকল সনৎ। গলাটা সামান্য বাড়িয়ে বাইরেটা দেখল। তারপর কোণের দিকে আরও সরে এল, 'মামা কোথায় গেছে রে ?'

কমলা চিরুণি দিচ্ছিল মাথায়। মুখটা ফেরানো অবস্থায় ছিল ওর। সনতের কথায় অল্প ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, 'কে, বাবা ?'

'হ্যাঁ।'

'কাজে বেরিয়েছে।'

'চাকরি পেয়েছে মামা ?'

কি উত্তর দেবে খুঁজে পেল না কমলা। সনতের প্রশ্নের কী উত্তর দেবে ? আগে সনৎ শ্যামবাজারের বাসায় আসত, তখন এ-সব কথা উঠত না। উঠলে জবাব দিতেও কুণ্ঠা ছিল না কোনো। কিন্তু আজ ? আজ সনৎদা সব বুঝতে পেরেছে। …শুধু বাবার চাকরি গেছে, আমাদের সংসারে অভাব, আমাদের যা ছিল একে একে আমরা সব হারিয়েছি, শেষ পর্যন্ত বস্তীর মত জায়গায় উঠে এসেছি আমরা…কমলার চোখ হু'টো চিরুণি ধরা হাতে এসে পড়ল। কব্জিতে। কব্জি থেকে গলায়। হাতের ছ-গাছা করে সোনার চুড়ির এখন আর কি আছে ? এক গাছা করে সম্বল।…কাচের চুড়ি দিয়ে হাত ভরেছি আমরা। আমি মা, নীহার—সকলে। গলার অবস্থাও তাই…।

কমলার গলায় ছিল রুদ্রাক্ষ-হার। তিন ভরির। সেটাও টান পড়ল। পাই পয়সা পর্যন্ত বাসার বাকি ভাড়া চুকিয়ে দিলেন কমলাপতি। বেশ মোটা টাকার দরকার পড়েছিল। মা-মেয়ের তিন গাছা হারও গেল। রইল শুধু পারুলের গলার সরু চেন হারটা। মাত্র চৌদ্দ আনা সোনার হার। চুড়িটুড়ি কি

ছোট খাটো গয়নাগাঁটিগুলো ছ-মাসের অভাবের মধ্যে একে একে যেতে যেতে শেষ হতে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত ভারীগুলো গেল একবারে।

পারুলের সেই চৌদ্দ আনার হারটা এখন কমলার গলায়। পারুলের গলা খালি।

'...ওইটুকু মেয়ের গলায় হারের দরকার নেই', সুষমা পারুলের গলার হার খুলছিল।

পারুল কেঁদেছে। ভয়ানক কান্না। না, সে কিছুতেই খুলতে দেবে না হার। কিছুতেই নয়।

ধমক দিয়েছে সুষমা; দু' একটা চড়-চাপড়ও রাগের বশে, 'সাহস দেখ এইটুকু মেয়ের! কেন, কিসের অত হার পরার দরকার? খোলামেলা বস্তীবাড়িতে যাচ্ছ, কত রকমের লোক আছে সেখানে, কখন কে খুলে নেবে তার ঠিক নেই।'

ছোট অবুঝ মেয়ে পারুল, সে বোঝেনি; কেঁদেছে।

আপত্তি করেছিল কমলা, 'থাক না মা, ওর গলাতেই থাক।'

'চুপ কর তুমি,' সুষমা ধমকে উঠেছিল কমলাকে। 'অতবড় ধিঙ্গি মেয়ে, সোমত্থ, খালি গলায় কি করে গিয়ে অন্য পাড়ায় উঠবে?'

কিন্তু কমলা জানে, আর ক' দিন পর এ-হারও থাকবে না। যেমন করে একে একে খাট, চেয়ার, আলমারী, রেডিও টেডিও গেল—তেমনি টান পড়বে আবার। এ-হারও যাবে স্যাকরার দোকানে। নিজে হাতে করবেন না কমলাপতি, অবিনাশকে দিয়ে বিক্রী করাবেন। যেমন করছেন এখানে এসে।

কতক্ষণ, কত সময় ধরে এই তিক্ত বিষণ্ণতা এবং হতাশ আর ক্লান্তভাবে ঝিম মেরে বসেছিল হুঁশ নেই কমলার।

সেই বিষণ্ণতার ঘোর ভাঙল একটা শব্দে। এতক্ষণে। দীর্ঘ-নিশ্বাস চেপে কমলা আস্তে তুলল মাথাটা, তাকাল সনতের দিকে।

সনৎ সিগারেট ধরাল শব্দ করে।

আরও কোণের দিকে সরে গেছে সনৎ, যেন বাইরে থেকে কেউ না দেখতে পায়। সনৎ সুষমার চোখকে ফাঁকি দিতে চাইছে—তার হাবভাব ভঙ্গি-টঙ্গিগুলো কেমন কৌতুককর মনে হল কমলার কাছে। অল্প হাসল কমলা সনতের দিকে তাকিয়ে।

'এই সুনুদা, তোর তো খুব সাহস!' কমলা ঈষৎ চাপা গলায় কথাটা বলল হাসিমুখে। এবং খুব চাতুর্যের সঙ্গে কায়দা করে অন্য প্রসঙ্গে কথাটাকে ফেরাতে চাইল, 'হঠাৎ যদি মা এসে পড়ে?'

'তুই তো রয়েছিস,' সনৎ গলগল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল, 'মামী এলে বলিস আগে থেকে।'

'ইস্, বয়ে গেছে আমার।' কমলা এমন ভাব দেখাল যেন এখনি উঠে যাবে ও।

একমুখ ধোঁয়াসুদ্ধ চাপা শাসনের গলায় ধমক দিল সনৎ, 'অ্যাই, বোসনা একটু। মাইরী আর দু'টো টান মাত্র।'

তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য ঘন ঘন এবং জোরে জোরে সিগারেটটা টানছিল সনৎ। আর বাঁ-হাতে মুখ থেকে ছাড়া ধোঁয়াগুলো বাতাসে ছড়িয়ে দিতে চাইছিল হাত নেড়ে নেড়ে। নাক মুখ দিয়ে গলগল করে বেরুচ্ছিল ধোঁয়া। আর এই ছোট ঘরটা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় প্রায় একাকার হয়ে উঠল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল কমলার। গুলিয়ে উঠছিল গা।

'ইস্, তুই যে কি করছিস সুনুদা, আমি কিন্তু চললাম।

দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার।' অত্যন্ত বিরক্তি আর অস্বস্তির সুর কমলার গলায়।

'দাঁড়া দাঁড়া,' ধোঁয়া-চাপা প্রায় দম-আটকানো গলায় বলল সনৎ।

আধ ইঞ্চিখানেক অবশিষ্ট সিগারেটের টুকরোটায় শেষ টান দিয়ে তক্তপোষের পায়ায় চেপে আগুন নেভাল সনৎ। তারপর উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে এসে বসল।

'বড্ড ছোট এই ঘরটা,' সনৎ টালিছাওয়া ছাদের দিকে তাকাল। 'মামা থাকে এ-ঘরে, না?'

'হ্যাঁ।'

'মামী?'

'আমরা ও-ঘরে।' অপ্রসন্ন গলায় জবাব দিল কমলা। 'মাঝে মাঝে পারুল শোয় বাবার কাছে।'

'তবু ও-ঘরটা একটু বড় আছে।' পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল সনৎ। দেওয়াল টেওয়ালগুলোর ওপর দিয়ে চোখটা ঘুরিয়ে আনল, তাকাল ক্যালেণ্ডারের দিকে।

'কত ভাড়া রে এ-বাড়ির?'

'তিরিশ টাকা।' মুখ নামিয়ে বলল কমলা।

আসলের সনতের মুখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে কথাটা বলতে বাধছিল। তাই মুখ নামাল কমলা। আসল ভাড়ার উপর আটটা টাকা চড়িয়ে অনায়াসে মিথ্যে কথা বলাটা খুবই শক্ত। কমলা তার গলার স্বরের কাঁপুনিটা পর্যন্ত ধরতে পারল এখন। এবং তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে কেন যেন কোনো কথাই ফুটল না তার গলায়।

'থার্টি!' অবাক সুরে উচ্চারণ করল সনৎ, 'টু মাচ্;

তোদের শ্যামবাজারের অত বড় সুন্দর বাসা তার ভাড়া ছিল কত, সত্তর না? তা হলেই দেখ। বস্তীর বাড়িঅলারা শালা কসাইয়ের জাত।'

সনৎ থামল। ছোট ঘুলঘুলির মত জানলায় চোখ ছিল, এবার দেওয়ালে চোখ ফেরাল সনৎ। চূণকাম শূন্য, পলেস্তারা খসে খসে যাওয়া ড্যাম্পধরা দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় ইট বেরিয়ে আছে। তাতে গোটা কয়েক ক্যালেণ্ডার। দৈর্ঘে প্রস্থে ঘরটা প্রায় সমান, তিনটি ক্যালেণ্ডার তার তিন দেওয়ালে। এ-গুলো চিনতে পারল সনৎ। শ্যামবাজারের বাসাতেও দেখেছে ক্যালেণ্ডারগুলো। এখন সামান্য ময়লার ছোপ লেগে মলিন দেখাচ্ছে। বিবর্ণও যেন। একটা নিচুমত টুল, তার ওপর বড় একটা ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের ঢাকনাটা আছে যদিও কিন্তু ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাওয়া খাবলা মত জায়গাগুলো দিয়ে গা দেখা যাচ্ছে ট্রাঙ্কের। বরং ঢাকনাটা না থাকলেই ভাল হত। আলনা আছে; তক্তপোশের ওসারের দিকে দেওয়াল ঘেঁষে; তাতে ছু'টো একটা কাপড়, ছেঁড়া সুজনির মত কি একটা, অত্যন্ত নোংরা একটা ছোট সাদা খাটো-প্যাণ্টও। ওটা হয়ত মামার আণ্ডারওয়ার। গুটি ছু'য়েক ছিটের ব্লাউজ, তার একটা লাল ফুটকি ফাটকি ছিটের, অন্যটা ঢেউখেলান শরু বর্ডার টানা, ঘাম নোংরা টোংরার দাগ আছে। ব্লাউজ ছু'টো ঝুলছে আলনার মাথার দিকে। দরজার কোণের দিকে একটা ডাঁটি শেষ হয়ে আসা ঝাঁটা, ঘর ঝাঁট দেওয়া কিছু ধুলো ময়লা নোংরা কাগজও।

সনৎ একবার উঠল, বারান্দায় এল, সেখানে দাঁড়াল খানিক। তারপর পাশের ঘরটার সামনে দিয়ে একপাক ঘুরে এসে দাঁড়াল দরজায়।

আয়না থেকে চোখ তুলল কমলা, বিনুনি শেষ করে

ফিতের গিঁট দিচ্ছিল ও, বলল, 'কীরে, ঘরে গরম লাগছে নাকিরে সুনুদা ?'

'না।' সনৎ ঘরে ঢুকল। বসল আবার তক্তপোষে। 'অনেক ভাড়াটে এ-বাড়িতে, নারে কম

'হ্যাঁ, পাঁচ ঘর।'

তক্তপোষ থেকে উঠল সনৎ, মাদুরে বসল। 'তোদের সামনের দিকের ঘরে একটা বউ····· '

'রুমা বৌদি', কমলা সনতের মুখের কথা কাড়ল। 'নন্দদার স্ত্রী।'

'তোরা দেখছি এর মধ্যেই সম্বন্ধ টম্বন্ধ পাতিয়ে বসেছিস !' সনৎ হাসল সামান্য, 'বউটা কেমন তাকিয়ে আছে দেখেছিস ?'

'থাক না, তোর তাতে কি ?'

ঘাড়ে হাত দিল সনৎ, চুলকোল কয়েকবার। চুলকোন না ওঠা সত্ত্বেও, 'আমার কিছু নয়, এমনি বলছিলাম। ওর স্বামী বুঝি নেই এখন ?'

'না। কাজে গেছে।'

'কখন ফেরে রে ?'

'রাত্রে। ন-টা দশটায়।'

'বাব্বা,' সনৎ পা ছড়িয়ে দিল দরজার দিকে, পেছনে দু' হাত ঠেলে মেঝের ওপর ভর করে অনেকটা চিৎ হয়ে আধশোয়া-ভাবে বসল, 'কারখানা টারখানায় কাজ করে নাকি রে ?'

'জানি না।' কমলা আয়না হাতে উঠে দাঁড়াল।

বেরিয়েও গেল কমলা। এ-ঘরে সনৎ একা। তেমনি ভাবে বসে রইল সনৎ। উঠল না।

ও-ঘরে কি কথা হচ্ছিল, সনৎ শুনতে পাচ্ছিল না কিছুই। শব্দটুকুই যা কানে আসছিল। আর সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে এক আধটু হাসির দমক। নিখিল আর নীহারের হাসি।

কমলা ফিরল না, সনৎ সোজা হয়ে সহজভাবে বসল।

নীহার আর নিখিলের ব্যাপারটা সনৎ জানে। সনতের গরজ ছিল না তেমন, নিখিলই তাগাদা দিত রোজ, 'কীরে সনৎ, ঠিকানা জোগাড় করেছিস?'

'না।' সনৎ গম্ভীর হত খানিক।

'একটা হোপলেস চ্যাপ তুই। এতদিন ধরে বলছি তোকে…'

'আমি কি করব? কাশীপুর না বরানগরে উঠে গেছে শুনেছি; ঠিকানা পাইনি।'

অথচ ঠিকানা জানত সনৎ। আগেই জেনেছিল। সুষমাই ঠিকানা দিয়েছিল তাকে। দিয়ে বলেছিল, 'যাস বাবা একবার; না হলে পারিস তো একবার আসিস, উঠে যাবার তারিখ বলব—সঙ্গে যাবি তুই। গেলে একটু উপকার হয় আমাদের।' কিন্তু সনৎ আর আসেনি। ও-সব ঝুট-ঝামেলা আর মালপত্র টানাটানির ব্যাপারে সনৎ নেই।

দিন দশ পনের ফাঁকি দিয়েছিল সনৎ, ঠিকানার ব্যাপারে মিথ্যেমিথ্যি কথা সাজিয়ে বলেছিল অনেক, শেষ পর্যন্ত বলবে কি বলবে না এই এক সমস্যা দেখা দিল। দোটানা ভাব। সনৎ জানে নীহার এবং নিখিলের ভালবাসার ব্যাপারটা এখন বেশ গাঢ় হয়েছে। চিঠিফিটিও দু' দশখানা আদান প্রদান যে হয়নি এমন নয়। কিন্তু মামার অবস্থা পড়ে গেছে, এ-কথা জানত সনৎ—-এখন কাশীপুরে গিয়ে কি অবস্থায় ওদের দেখবে; খুবই খারাপ কিনা, এবং তার মধ্যে নিখিলকে নিয়ে তোলা সঙ্গত কিনা—এ-সব কথা ভেবে ইতস্ততঃ করছিল সনৎ।

'তোকে চিঠি ফিটি দেয়নি নীহার?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল সনৎ।

'না।' নিখিলের মুখ অল্প ম্লান দেখাল, 'ব্যাপারটা কি হল বুঝতে পারছি না।'

'থাক, বুঝে আর কাজ নেই তোর।' নিখিলের মুখের ম্লান ছায়াটুকু দেখল সনৎ, 'চা খাওয়াবি?'

'চল।'

নিখিলের পিঠে জোরে একটা থাপ্পড় মারল সনৎ, 'আমি হোপলেস, না তুই রে? একেবারে মুষড়ে গেলি যে শালা।'

চায়ের দোকানে বসে আসল ব্যাপারটা খুলে বলল সনৎ। মামার চাকরি যাওয়ার কথা, কাশীপুরে উঠে যাওয়ার কারণ, মায় গয়নাগাঁটি ফার্ণিচার বিক্রী টিক্রীর সব কথাই।

শুনে চায়ের কাপ সামনে রেখে একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল নিখিল।

মামার সংসারের পতনের ইতিহাসটুকু শেষ করার পর সনৎও স্তব্ধ। কথা বলতে পারছিল না, নিখিলের দিকে তাকাতেও নয়।

চা-য়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছিল। গরম চায়ের ধোঁয়া; এক সময় সেই ধোঁয়াও হালকা হতে হতে আর উঠল না। নিকুঞ্জ কেবিনের টেবিলে তুই বন্ধু মুখোমুখি স্তব্ধ বোবা হয়ে বসে রইল।

'তুই যাবি?' এক সময় সেই নিস্তব্ধতা ভাঙল সনৎ। 'যদি যাস তো বল, ঠিকানা আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলল না নিখিল। সনতের কথায় স্তব্ধতার ভাবটা কেটে গেলে, মাথা নিচু করে চা-য়ের কাপে চুমুক দিল, বলল, 'যাব তো নিশ্চয়ই,···যাবোই।'

নিখিল হেসে উঠেছিল জোরে, নীহার ধমক দিল চাপা সুরে, 'এই করছ কী, দিদি রয়েছে না ও-ঘরে?'

'থাক না', নিখিল আমলে আনতে চাইল না কথাটা, কিন্তু দমকা হাসিটা চাপল, 'অজানা কিছু কি আছে ?'

'আহা, জানলেই বা, লজ্জা নেই তা বলে ?'

প্রথমে নীহারের ইশারায় এ-ঘরে এসে ঠিক সহজ হতে পারছিল না নিখিল। সনতের বলা কথাগুলো মনে পড়ছিল যেমন, তেমনি এই বাড়ি, ঘর এবং এখনকার অবস্থা—এ-সব দেখে খুবই হতাশ হয়েছিল নিখিল। এখন কথায় কথায় সেই হতাশ ভাবটুকু কেটেছে। সহজ স্বাভাবিকতাটুকু ফিরে পেয়েছে যেমন নিখিল, তেমনি নীহারও।

এতক্ষণে সুষমার গলার স্বর শুনে চুপ করল ওরা। সুষমা ডাকছে। পারুলকে।

পারুল এ-ঘরে এসেছে অনেক আগেই। নিখিলই হাত ধরে নিয়ে এসেছে ওকে। এক মুঠো চকোলেট দিয়ে কোলের কাছে বসিয়েছে।

পারুল চকোলেট চুষছিল না, বরং কামড়ে চিবিয়ে চাবিয়ে খেয়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি। অনেকটা গরিব ঘরের খেতে না পাওয়া ছোট ছেলেমানুষের মত। নীহার পারুলের সেই হ্যাংলাপনা দেখছিল আর রাগে থেকে থেকে দাঁত কামড়াচ্ছিল। সে-দিকে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ ছিল না পারুলের। বরং চটপট চকোলেটগুলো শেষ করতে করতে অনেকটা অবাক ভঙ্গিতে মেজদি আর নিখিলদার কথা শুনছিল, যার কোনো অর্থই পারুল বোঝে না, অথচ ভাল লাগে ওর। মেজদির এই রূপ সুন্দর লাগছিল পারুলের কাছে। মনে মনে ভাবছিল পারুল—মেজদি কেন রোজ এমনি থাকে না, এমনি হাসিখুশী মানুষ হয়ে! সব সময় এমনি হাসবে মেজদি, অনেক কথা বলবে এমনি। মেজদির এই রূপ অনেকদিন দেখে না পারুল, এখানে আসার পর তো নয়ই। গম্ভীর, মুখে কেমন

দুঃখ মেখে যে থাকে মেজদি, দিনরাত বকে পারুলকে, ঝগড়া করে মা, দিদির সঙ্গে ; কাঁদে। পারুলের কাছে কথাগুলো দুর্বোধ্য লাগলেও, ঘরের এই সুন্দর ছবিটুকু বড় ভাল লাগছিল।

'মা তোকে ডাকছে পারু,' নীহার নিখিলের পাশে সরে এল।

পারুল উঠল। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল একবার।

নীহার সরে এসেছিল কাছে, হাতটা প্রায় কোল ছুঁয়ে মেঝের ওপর রাখা, সেই হাতে যেন নিখিলের হাত ভুল করে ছোঁয়া পেল। হাতটা ধরল নিখিল ; অল্প চাপ দিল।

উঠে সরে গেল নীহার। কুঁজোটার কাছে। কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল ভরল নিজের জন্য, খেতে যাবে, নিখিল হাত বাড়াল, 'আমাকে দিও একটু।'

'এটাই নাও না হয়।'

'না, তুমি খেয়ে নাও আগে।'

'তুমিই খাও না', অল্প হাসল নীহার।

হাত বাড়িয়ে গ্লাস নিল নিখিল। জল খেল। গ্লাসটা ফেরৎ দিল, 'এবার চিঠি দেবে তো, সত্যি ?'

নিখিলের হাত থেকে গ্লাস নিল নীহার, কথা না বলে, মাথা নেড়ে জানাল, দেব।

আর কিছু বলল না নিখিল। একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল নীহারের দিকে। তাকিয়ে কি ভাবল। হয়ত নীহারকেই পরখ করছিল নিখিল। নীহারের গা হাত পা এবং মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। দেখতে চাইল, কাশীপুরে এসে স্বাস্থ্যের পরিবর্তন কতটুকু হল নীহারের। কতটা সরু কি মোটা হল। দেখা শেষ করে নিখিল ওপরের দিকে চোখ তুলল, সিলিংয়ের

দিকে। এখনই যেন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে মাথার ওপরটা। গরমও লাগছিল। নিখিল পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ ঘাড় গলা মুছল, গুটনো হাতার নিচে কব্জির ভাঁজটাও।

নীহারও মুখ মুছল আঁচলে, বলল, 'গরম লাগছে তোমার ?'

'অল্প।' নিখিল নীহারের দিকে তাকাল, তারপর দেওয়ালে।···'একটাও জানলা দেখতে পাচ্ছি না এ-ঘরে।'

'নেই।' নীহার আস্তে দরজার কাছে সরে এল, 'গরম লাগলে না হয় বারান্দায় গিয়ে বস।'

'তার চাইতে একটা পাখা টাখা থাকে তো, দাও।'

এ-ঘরটা কমলাপতির ঘরের চাইতে দৈর্ঘে এবং প্রস্থে বেশ খানিকটা বড়। যেমনি বড় এ-ঘরটা তেমনি অগোছাল জিনিসপত্রের বাহুল্যও এখানে। কোনো তক্তপোষ নেই। ঢালা মেঝের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে বিছানা পাতার জায়গা। কিছু হাঁড়িকুড়ি, বাসনকোসন, ট্রাঙ্ক-সুটকেশ, দেওয়ালে একটা ব্র্যাকেট, আলনাও আছে একটা—আর কাপড় চোপড়। একটা হোয়াটনট, কিছু কৌটো শিশি-বোতল, গোটা কয়েক গ্লাস বাটি প্লেট সাজানো রয়েছে ; ওপরের তাকে আয়না-চিরুণী, পাউডারের পুরনো কৌটোও।

পাখাটা হোয়াটনট আর দেওয়ালের ফাঁকে ছিল, নীহার পাখাটা নিয়ে এল, নিখিলের কাছে দাঁড়িয়ে হাসল অল্প, 'কি, হাওয়া করব নাকি ?'

'করবে ?···'হাত বাড়াল নিখিল, 'না থাক, আমিই পারব। তুমি কেন মিছেমিছি কষ্ট করবে আমার জন্যে।'

'না হয় করলামই একটু,' ঠোঁটের ফাঁকে কৌতুকের হাসি হাসল নীহার, 'পুণ্য হবে।'

নীহার হাওয়া করতে শুরু করল। স্নিগ্ধ আত্মতৃপ্তির সুন্দর এক টুকরো উজ্জ্বল হাসি তার মুখে। মুগ্ধ ভঙ্গিতে নিখিল নীহারকে দেখছিল।

রান্নাঘরে যেতে এ-ঘরের সামনেটা প্রয়োজন হয় না। তবু কমলা ইচ্ছে করেই ওদের শোবার ঘরের সামনে দিয়ে ঘুরে এল এক পাক। কমলা জানে, এখানে আসবার পর এই প্রথম অত্যন্ত উৎফুল্ল এবং সহর্ষভাবে কথা বলছে নীহার। নীহার নিখিলকে ভালবাসে। বাসুক। কমলার বিন্দুমাত্র অস্বস্তি কিংবা অন্য কোনো কুৎসিত ধারনা নেই তার জন্য। নীহার দেখতে সুন্দর, নীহার চপল এবং অল্প অস্থিরতা আর অধৈর্যের ভাবও নীহারের মধ্যে আছে। এই জেদি মেয়েটাকে নিয়ে, মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। নীহারের বয়স বাইশ। তা হোক, তবু বছর তিনেকের ছোট সে কমলার চাইতে; জেদি আর চপল মেয়েদের বিচারবুদ্ধি কম, কমলার বিশ্বাস। আর তার জন্যই এই বিব্রত ভাব এবং ভয়। নীহার যে কখন কি করে বসবে, হয়তো বুঝবে না, বুঝলেও আগু পিছু না ভেবে হঠাৎ এমন কোনো কাজ কি কিছু করে বসতে পারে যার জন্য পরে অনুতাপের জ্বালায় জ্বলতে হবে।

বারান্দা ঘুরে এসে কমলা উঠোনে নামল। আধা টিন আর আধা খাপড়া-ছাওয়া রান্নাঘরটার সামনে।

কুয়োতলা থেকে রুমা ফিরছিল। পরনে ভেজা শাড়ি, লাল রঙের একটা গামছা বুকে ফেরতা দেওয়া। রুমার চোখেমুখে কপালে গলায় বিন্দু বিন্দু শিশির ফোঁটার মত জল। শাড়ি সায়া ভেজা সপসপে, জল পড়ছে চুলের ডগা গড়িয়ে। কমলাকে দেখে রুমা থামল। শাড়ির নিচু দিকের

খানিক অংশ হাতে চেপে জল নিঙরে পায়ে ফেলল, 'কে এল তোমাদের ঘরে, কমলা ?'

'আমার পিসতুতো ভাই ; দাদা হয়।'

'আর ও-টি ?' রুমা কমলাদের শোবার ঘরের দিকে তাকাল।

কমলা আর একবার ঘরের দিকে তাকাল। তাকিয়ে নিখিল আর নীহারকে দেখল, 'নিখিল' রুমাকে নামটা বলল কমলা, 'আমার দূর সম্পর্কের ভাই হয়।'

কথা শেষ করে কমলা রুমার মুখের দিকে এক পলক তাকাল। তারপর চলে এল সোজা রান্নাঘরে।

সনৎ নীহারদের ঘর হয়ে শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরে এসে দাঁড়াল।

সামান্য হালুয়া করেছিল সুষমা ; তাব রঙটা কেমন কালচে ভাব ধরা। ঘরে দুধ নেই। দুধ অবশ্য অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। পেটের ভাত জোগাতে সর্বস্ব গেল, আর দুধ! সুষমা উনুনে কেটলি চাপিয়ে থালায় দলা পাকানো হালুয়া দেখছিল। গুঁড়ো দুধ এক-আধটু ঘরে আসে ; তাও এক আধ কাপ চা-য়ের কল্যাণে। সেই গুঁড়ো দুধটুকুব কিছু চা-য়ের জন্য রেখে, বাকিটা গরম জলে গুলে হালুয়ায় ঢেলেছে সুষমা।

যত্ন করে করতে গিয়ে. শেষ পর্যন্ত হালুয়ার কালচে রঙেব দিকে তাকিয়ে সুষমা নিশ্বাস ফেলল। দীর্ঘনিশ্বাস। জোরে, শব্দ করে।

'তুমি আবার এ-সব কী করছ মামী ?'

সামান্য চমকাল সুষমা। ঝিমধরা বিষণ্ণ ভাবটা করুণ মুখের গা থেকে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলতে চাইল।

সনতের দিকে মুখ তুলে তাকাল সুষমা ; কিছু বলল না। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম—গলার এবং ঘাড়ের প্রায় দরদর করে বয়ে যাওয়া স্রোতটুকুও আঁচলে মুছল। উনুনের আঁচ, এই সাড়ে তিন হাতি ছোট ঘরের বদ্ধ বায়ু আর গুমোটে সুষমার মুখচোখে লাল আভা ফুটে বেরুচ্ছিল। সুষমা কেটলির ঢাকনাটা তুলল আঁচল চেপে ; গরম যাতে না লাগে। শেষে আস্তে গলায়, সনতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, তেমন কিছু নয়রে।'

'নয় মানে ?' সনৎ হাঁটু মুড়ে মামীর পাশে বসল, 'এই যে হালুয়া-টালুয়া দেখছি।'

অপ্রতিভ, বিষণ্ণ—বুঝি এক উপচানো কান্নাকে গলার কাছে, কণ্ঠায় চেপে অনেকটা ভাঙামত গলায় সুষমা বলল, 'সনৎ, কি আর খাওয়াব তোদের...' তার কথাটাও ফুটল না পুরোপুরি। সনতের দিকে তাকিয়েছিল সুষমা ; কথা শেষ না করে মুখ ফেরাল। বুঝি সমস্ত দৈন্যতার আবরণটুকু হুট করে খুলে দিতে কোথায় যেন বাঁধছিল তার।

চার

অবাধ্য জেদি মানুষও কথা শোনে কারও কারও। সকলেব না হোক, কোনো বিশেষ মানুষ কি গুরুজনকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, আদেশ শোনে। শুধু মানুষ কেন, কত রকমের পশু আছে, বন্য কি পোষা তারা পর্যন্ত। কিন্তু সময় শোনে না। চাবি না দিলে ঘড়ি বন্ধ থাকে, সময় থাকে না। তাকে ধরবার উপায় নেই, ছোঁবারও নয়। তাই ঋতুচক্রের আবর্তন বসে থাকল না। শুধু কাশীপুরের এলাকা কেন, সমস্ত দেশজুড়ে যত গরিব হতভাগ্য আধা-দরিদ্র গোছের লোক আছে তাদের বেদনা বুঝল না ঋতুচক্র। বর্ষা গিয়ে হুট্ করে শরৎ এল। আকাশের রূপ পালটে গেল কখন। বলা নেই কওয়া নেই, যখন তখন ঝুপঝাপ বৃষ্টি আসা, প্রায় লেগে থাকা ভেজা ঘিনঘিনে ভাব, গা-ম্যাজমেজে ভয়ঙ্কর অস্বস্তি দূর হল। ভেজা ঘুঁটে কি কয়লার উনুন ধরাবার জ্বালা—তার বিশ্রী ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসা —সব চুকেবুকে গেল।

রাখহরি দাস লেনের মানুষরাও হাপ ছেড়ে বাঁচল যেন। অন্ততঃ কমলাদের বাসা কি তাদের আশ-পাশের বাসিন্দারাও।

এই বাড়িটি পাশে ওসারে বিরাট না হলেও নেহাৎ ছোট নয়। পাঁচ ঘর ভাড়াটে এ-বাড়ির এই বর্ষাকালটা কী করে না কাটায়! এমনিতে, অন্যান্য ঋতুতে যা হোক পচা দুর্গন্ধে নাড়িভুড়ি উঠে আসতে চাইলেও অনেকটা সহ্য করা যায়, থাকতে থাকতে অভ্যাসে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সমস্ত বর্ষাকালটা জুড়ে কত না দুর্গতি। আকাশ মেঘলা হয়ে

আসে প্রায় দিনই, রোদ মুছে যায় হঠাৎ, অন্ধকার ঘন হয়ে আসে। সেই অন্ধকার ঘন-হওয়া-বাদলা কখনও অবিশ্রান্ত-ভাবে ঝরতে থাকে ; জোরে কিংবা সারাদিন কি রাত ধরে--টিপ টিপ টিপ অবিরাম। কখনও হঠাৎ এক পশলা হয়ে থামল। আবার কয়েক ফোঁটা খানিক বাদে—সবটাই যেন বাদলার মেজাজ এবং মর্জি।

আস্তে হলে তবু রক্ষে। পরে রোদ ওঠে, উঠোন শুকোয় ; হাঁটা-চলাটা করা যায় উঠোনে। পথ ঘাট যাই থাক, মেয়েদের সঙ্গে তার বড় একটা সম্পর্ক নেই। কিন্তু যদি জোরে নামে, থামতে না চায়, তা হলে ড্রেন তো ভাসেই, ড্রেন-উপচানো নোংরা দুর্গন্ধ জল উঠোন পর্যন্ত ধাওয়া করে। আর সেই সঙ্গে রাজ্যের যত আবর্জনা, ময়লা নোংরা কদর্য জঞ্জালের রাশি রাশি স্তূপ জলের স্রোতে জমা হয় এখানে। এ-ঘর ও-ঘর করতে ঘেন্না হয় তখন ; মল ভাসে জলে, আরও কত কি…।

একদিন এই বৃষ্টিও কমল। রোদমোছা ছাই ছাই রঙের অলস ভেজা দিনগুলো শেষ হল। মেঘলা কেটে স্বচ্ছ হল আকাশের রঙ। মেঘের রঙও সেই সঙ্গে। ভারী কালো কুৎসিৎ মেঘ হালকা সুন্দর শ্বেতাভ হয়ে উড়ল নীল আকাশে ; রোদের রঙটা পর্যন্ত চকচকে। সুন্দর এক আভা ফুটল দিনের বেলায় ; রাতের আকাশে চাঁদ উঠলেও।

কমলাদের বাসায় কাঁচা উঠোন। মাটির। বর্ষায় যেমন কাদায় কাদায় কর্দমাক্ত হয়ে যায়, বেশি রোদে আবার সেই কাদা শুকিয়ে ধুলো হয় ; ভয়ানক ধুলো ওড়ে বাতাসে। বর্ষার পর ঘাস গজিয়েছিল উঠোনে, কোণে ঘুপচিতে আগাছাও। ঘন ঝোপ হয়েছিল আগাছার। অবিনাশ সে সব একদিন কেটে উপড়ে সাফ করল। এখন উঠোনের রূপ

অন্য। সারা ভাদ্র মাস কাটল, বৃষ্টিটৃষ্টি তেমন আর হল কই! চড়া রোদে ঘাসটাস, আগাছার জঙ্গলের চিহ্ন পর্যন্ত থাকল না।

কমলাদের বাড়ির মানুষগুলোর নিত্যকার জীবন এক ছকে বাঁধা। নিতান্ত একঘেঁয়ে। শীত গ্রীষ্ম থেকে বর্ষা কি বসন্ত কোনো ঋতুতেই এর পার্থক্য নেই। একই নিয়মে চলে সকল বাসিন্দারা। অন্ততঃ তাই দেখে আসছে কমলারা।

এ-বাড়ির ভাড়াটের সংখ্যা ছিল তিন। দেখতে দেখতে ক-মাসের মধ্যে পাঁচে দাঁড়াল। লোকজনও কিছু বাড়ল সেই সঙ্গে। অবশ্য এ-বাড়িতে যা একটু সম্ভ্রম তা কমলাদেরই। বাড়ির যে দু'খানা ভাল ঘর, ইটের দেওয়াল, ওপরে টালি—এক আধটু ভাঙাচোরা যে নেই তা নয়—তবু এর সম্মান আলাদা। ভাড়া বেশি, ঘরও দু'খানা। দু'কোঠা। এ-বাড়িতে এমনটি কারো নেই। সকলেই দশ কি পনেরো টাকা ভাড়ার একটি করে কোঠা নিয়ে আছে।

কমলাদের দু'খানা ঘর এক সারিতে। রাস্তার দিকে মুখ করা। পুব দিকের কোঠাটাই মা-মেয়েদের জন্য ; পশ্চিমের ঘরখানায় কমলাপতি থাকেন। রাখহরি দাস লেন থেকে যে রাস্তাটা ঢুকেছে এ-বাড়িতে তার বাঁ-দিকে সন্ধ্যাদের ঘর। টিনের ছাউনী, আলকাতরা মাখানো ক্যানেস্তারার বেড়া। ঘরখানা প্রায় কমলাপতির ঘরের সঙ্গে লাগানো। রাস্তার দিকে পেছন দেওয়া, ড্রেন ঘেঁষে যে ঘরখানা, সে-টা রুমাদের। তার ছাদটা টালির, বেড়ার নিচু অংশটা ইটের, ওপরের টুকু পুরনো করোগেটের। ঘরটা কমলাদের ঘরের সমান্তরাল, কিন্তু লম্বায় অর্ধেকের চেয়েও ছোট। দরজাটা মুখোমুখিই। আরও দু'টি ঘর আছে এ-বাড়িতে, কমলাদের বারান্দার পর সরু একফালি পথ। কুয়োপাড়ের। তারই পাশে লম্বা ধরনের

অথচ প্রস্থে ছোট ঘর। এ-ঘরখানার শুরু রুমাদের ঘর থেকে, লম্বায় খানিক দূর এগিয়ে কুয়োপাড়ের পথে থেমে গেছে। দু'টি কোঠা এই ঘরে। একটা খালি ছিল আগে। কমলারা আসবার পরও। ভাড়া হয় না, হয় না, শেষ পর্যন্ত মাস দুই আগে নতুন ভাড়াটে এল। তারা চারটি প্রাণী। এরা রেফ্যুজি।

বর্ষা গিয়ে শরতের হাওয়া পড়ল, দিন সুন্দর হল; হাওয়া-টুকু পর্যন্ত। সে দিনও পার হতে হতে ভাদ্র মাস গেল। এবার আশ্বিন। পুজো এল এল সময়।

খাওয়া-খাত্তির পাট চুকেছিল অনেকক্ষণ। এ-বাড়ির ঘরে ঘরে কপাট বন্ধ হল, আলো নিভল। সম্ভবত অসাবে ঘুমোচ্ছে এখন সকলে।

সুষমা অপেক্ষা করছিল অনেকক্ষণ থেকে। পারুল আবার মা-কে পাশে না পেলে ঘুমোয় না। কমলা কি নীহার, ওরাও ছোট নয়। বয়স হয়েছে, বুঝতে শিখেছে সবই। ওদের সামনে কি করে সুষমা কমলাপতির ঘরে যাবে! মেয়েদের চোখে ঘুম নেমে আসার অপেক্ষা করছিল সুষমা।

বিছানাটা মেঝেব ওপর ঢালা। বেশ বড়সড়। এক-পাশে কমলা, তারপব নীহাব। সুষমা শেষ ধারে শোয়। নীহার আর তার মধ্যে পারুল। এতক্ষণ উসখুস করছিল পারুল, ঘুমোচ্ছিল না কিছুতেই। এবার একটু যেন শান্ত হয়েছে। স্থির হয়ে পড়েছে। সম্ভবত পারুল ঘুমল এখন।

তক্তপোষের ওপর শুয়ে অনেকক্ষণ ছটফট করলেন কমলাপতি; উঠেও বসলেন দু'একবার। একটা বিড়ি ধরিয়ে পা ঝুলিয়ে বসলেন খানিক—এক সময় নেমে পায়চারিও করলেন মেঝেয়। তারপর শিয়রেব কাছে রাখা ঘটি থেকে একগ্লাস জল গড়িয়ে খেলেন।

দরজা ভেজানো ঘরে এতক্ষণ জমাট অন্ধকার ছিল, সামান্য হালকা আলোর বিস্তার দেখা গেল এতক্ষণে। যেন গাঢ় কালো কালির দোয়াতে অল্প শাদা রঙ ঢেলে দিল কেউ। সেই সাদাটে ভাবটা ছড়িয়ে পড়ছে···ছড়াচ্ছে···ছড়াচ্ছে—অন্ধকারের চাপে নাড়া পড়ল। মৃদু আলোর মিশ্রণে অল্প ফিকে হল অন্ধকার।

এতক্ষণ এ-ঘরের দেওয়াল কি একটি দু'টি আসবাবপত্র—কিছুই চোখে পড়ছিল না; দেখতে পারছিলেন না কমলাপতি। এবার এই হালকা ফিকে অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে গোটা ঘরটার একটা পরিপূর্ণ ছবি চোখে পড়ল তাঁর। ছোট জানলাটা খোলা, তার কপাটে ম্লান আলোর অল্প শুভ্রতা।

চাঁদ উঠেছে আকাশে। আলোর একটু আমেজ অন্ধকাবে মিশেছে। যেন অভিমান কবা কোনো কিশোরী মেয়ে গুম মেরে থমথমে গম্ভীর মুখে কোণের দিকে বসেছিল চুপটি করে। প্রায় কান্না আসা মুখ, ছলছলে চোখ, থেকে থেকে ঠোঁটের অল্প কাঁপুনি, চোখের পাতাব অস্থিরতা এবং চিবুকের তলায় জমা বিন্দু বিন্দু ঘামের আভাষ—সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক ছায়া ছায়া অন্ধকার। সেই মেয়েব অভিমান ভাঙল, মা কি বাবার আদরে। হঠাৎ উথলে ওঠা কান্নার আবেগ চাপল; ছায়া মুছে এল মুখের—তারপর একটু খুশীর আলো ছড়াল তার মুখে। সদ্য ওঠা চাঁদের আলোর রঙটুকু যেন সেই কিশোরী মেয়ের মুখের অল্প আনন্দের আভাষ।

জানলার ওপর-কানিশের দেওয়ালে চাঁদের আলোটুকু ধাক্কা খেয়ে খানিকটা নিচের দিকে নেমেছে। খানিক জানলার পাল্লায়। ওপরে খানিকটা আলো; নিচে অল্প ফিকে অন্ধকার। তির্যক। মরচে-ধরা লোহার শিকের গা-য়ে অর্ধেকটা রঙ মাখানোর মতন আলো জড়িয়ে রয়েছে।

কমলাপতি জানলায় তাকিয়ে ছিলেন; তাকিয়েই থাকলেন। একমুহূর্ত কেমন এক স্তব্ধতা অনুভব করলেন। তারপর অদ্ভুত এক মোহ যেন তাকে টানল। স্তব্ধতার ভাবটুকু অন্য এক ভাবনায় নিয়ে চলল কমলাপতিকে। কমলাপতি এগুলেন। মন্ত্রমুগ্ধ কি নিশি-পাওয়া মানুষের মতন সজ্ঞান মনের অগোচরে পা দু'টো চলল তাঁর।

আকাশের রূপ এখন কেমন, কমলাপতি দেখতে পাচ্ছেন না। তবু গোটা আকাশের একটা ছবি তিনি আঁকতে পারছিলেন মনে মনে। শেষ হয়ে আসা শরতের আকাশ। অদ্ভুত গাঢ় নীলের চাঁদোয়া, তার গায়ে জরির চুমকি, শুভ্র সাদা সুতোর কাজের মত ছোট ছোট মেঘ। জরির চুমকি গুলো তারা। কমলাপতি এই জানলায় চোখ রেখে নিজের মনে আঁকা আকাশের একটা পরিপূর্ণ ছবি ভাবতে ভাবতে আচ্ছন্ন চেতনায় নিজেকে ভুলেছিলেন। অন্তত আজকের কমলাপতি—যার চাকরি নেই, দু'টো পয়সা আনবার মতন কোনো পথই খোলা নেই; আগামী কাল থেকে গোটা ভবিষ্যত যার কাছে এক অন্তহীন কঠিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

জানলার নিচের দিকের মেঝেয় গুটি-দুই ট্রাঙ্ক। ভীষণ এক অন্ধকার থেকে উঠে আসা, হঠাৎ আলোর গন্ধ পাওয়া মানুষের মত মোহাচ্ছন্ন কমলাপতি ঠোক্কর খেলেন। একটা কিম্ভুত শব্দ বাজল তাঁর পা-য়ের ঠোক্করে। পা থামল। কমলাপতি দাঁড়ালেন। অত্যন্ত হতাশ চোখে, নিরাশ মনে দেখতে পেলেন কমলাপতি— এই ছোট ঘরের পরিধির মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে। একা। অল্প আলোর আভাষ-মাখা পাতলা ফিকে অন্ধকার এ-ঘরে। বিছানার কোণের দিকে চৌকোনা একটা আলোর ক্ষেত্র।

আলো ধরে ওপরে তাকালেন কমলাপতি। ঘরের ছাদে।

···এ-ঘরের ছাদ টালির। অনুজ্জ্বল এই আলো ; তবু যেন প্রতিটি টালির চেহারা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বন্ধুর, অমসৃণ আর অত্যন্ত রুক্ষ এক ভাব। একটা টালি নেই। জায়গাটা ফাঁকা। সেই ফাঁক দিয়ে চৌকোনা আলোর ক্ষেত্র নেমেছে। পড়েছে কমলাপতির বিছানার এক অংশে।

এ-ঘরের ময়লা, পলেস্তরা-খসা দেওয়াল ; অমসৃণ মেঝে, ছাদ, ক্যালেণ্ডারের অস্পষ্ট ছবি, আলনা, একটা হাতপাখা, শিয়রের দিকের জলের ঘটি, ঘামে ভেজা ময়লা জামা—মায় ছেঁড়া জুতো পর্যন্ত কমলাপতি দেখলেন। ভ্রূতে একটা অদ্ভুত কাঁপুনির আভাষ পেলেন কমলাপতি। যেন এতক্ষণের এক অদ্ভুত স্বপ্নের জগৎ থেকে তাকে কেউ ছুঁড়ে ফেলে দিল নিত্যকার জীবনে। যে-জীবন অভাবে অন্নাভাবে তিক্ত। প্রতিটি দিনের দণ্ডে দণ্ডে এক অবক্ষয়ের নিয়ত গতি।··· কমলাপতি তাঁর সংসার, অভাব অনটন অভিযোগ—দিনান্ত আয়ের পথ খোঁজার ক্লান্তি পর্যন্ত ভাবতে পারলেন। এবং সুষমার কথাটাও মনে পড়ল তাঁর।···সুষমা আসবে। এই আসার পথ চেয়ে আমি দাঁড়িয়ে।···এবং কি আশ্চর্য, এই কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে কমলাপতির মন মেজাজ, ভাবনার প্রতিটি কথা, তার সুর, পথ—সব অদ্ভুতভাবে বদলে গেল। এই খানিক আগে এক মোহ, আলোর মাদকতা তাঁকে বেঁধেছিল, তারও আগে অন্ধকার ছিল। অভাব অভিযোগের কথাও মনে পড়েছিল। অত্যন্ত দারিদ্র্য পীড়িত অবস্থার কথাও ভাবতে পারছিলেন তিনি। আর এখন—সুষমা···সুষমা ···এক দানবীয় মন এবং স্পৃহা কমলাপতির রক্তে কথা কয়ে উঠল। সব তরঙ্গ মুছে গিয়ে বিশেষ এক চেতনা, বর্বর আদিমতা জেগে উঠতে চাইল।

'তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম…'

'হুঁ', কমলাপতি সুষমার গা-য়ে মুখ চেপে অস্পষ্টভাবে জবাব দিলেন।

'কিছুই ভাল লাগছে না আমার…'

কমলাপতি জবাব দিলেন না এবার। নিজের পা-য়ের আঙুল দিয়ে সুষমার পা-য়ের বুড়ো আঙুলটাকে চেপে ধরলেন জোরে। মুখটা তুলে আনলেন সামান্য ওপরের দিকে। সুষমার গা-য়ের ওপর।

সুষমা সোজাসুজি শুয়ে। চোখ টালি-ছাওয়া ছাদের দিকে সুষমার। কমলাপতির উষ্ণ নিশ্বাস সুষমার গলায় লাগছিল, গলা বেয়ে চিবুকের তলায় এসে ধাক্কা খাচ্ছিল। বিরক্তি অস্বস্তি এবং নিজের মনের অনুৎসাহ চেপে, অলস ভঙ্গিতে গা ছেড়ে দিয়েছে সুষমা। যেন এর জন্য সে তৈরি। আগে থেকেই।

'তোমার মেয়েরা বড় হল, বিয়ে-টিয়ের যে কি হবে…' নিশ্বাস চাপার মতন হঠাৎ বন্ধ হল সুষমার কথা। একটুক্ষণ। ধাক্কা খাওয়ার মতন অল্প শব্দ হল। সুষমার গলা শোনা গেল আবার। ঈষৎ কাঁপা অথচ স্পষ্ট, 'কালকের কথা ভাবতে গেলে চোখে ঘুম আসে না আমার। সামনে আবার পুজো আসছে…'

কমলাপতি জবাব দিলেন না এবারও। যেন কোনো কথাই তাঁর কানে যাচ্ছে না, শুনতে পাচ্ছেন না কিছু। তাঁর নিশ্বাসটা জোরে পড়ছিল, অত্যন্ত দ্রুতভাবে। সেই নিশ্বাসের অদ্ভুত এক কাঁপা শব্দও ছোট এই ঘরের স্তব্ধতায় স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

আরও দু' একটি কথা বলল সুষমা, তার কোনোটা শোনা গেল, আধপথে থামল কতক কথা; অসমাপ্তও রইল। তারপর

আর কোনো কথা নেই। সুষমা বলল না, কমলাপতিও নয়। যেন দু'টি মানুষ জলের অতল গভীরে ডুবে যেতে যেতে শেষ ক-টি বুদবুদ তুলল। তারপর সব চুপচাপ।

'এ-ঘরটা ছেড়ে দিলেই হয় আমাদের···'

'হুঁ।' কমলাপতি আস্তে করে জবাব দিলেন, মুখের বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে।

'ক-টা টাকা কমত তা হলে। দু' মাসের বাকি পড়ে গেছে এরই মধ্যে···' অত্যন্ত ক্লান্ত, নিস্তেজ, সামান্য জড়িয়ে আসা গলায় বলল সুষমা, 'দু'টো পয়সা আসবার পথ নেই অথচ···' সুষমা পাশ ফিরে কমলাপতির দিকে মুখ করে শুল।

তক্তপোষের পাশে কমলাপতি বসে। একটা পা ওপরে তোলা, হাঁটুমোড়া—অন্যটা ঝোলান। বিড়ি টানছিলেন কমলাপতি। নিরুত্তেজ নিরুদ্বেগ এক মূর্তি। যেন অন্য কোনো কথা, সংসারের, অভাব অনটনের, মেয়েদের বিয়ের ব্যাপার কি চাল শূন্য হাঁড়ির খবর—কোনোটাতেই তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ পর্যন্ত নেই।

শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হলেন কমলাপতি।

অনেকক্ষণ ধরে সুষমার কথা তিনি শুনেছেন। একমাত্র হুঁ এবং না ছাড়া অন্য কোনো কথা বলেননি। বলতে পারেননি। কিছু কথা কানে গিয়েছে, কিছু তিনি শুনতে পাননি। কিংবা শুনেও না-শোনার ভান করেছেন মাত্র। মনে মনে অনেক আগে থেকেই বিরক্ত হয়েছেন কমলাপতি কিন্তু সে-বিরক্তি প্রকাশ করেননি।···

আগে এমন ছিল না সুষমা। তখন কাছে শুয়ে হাসি ঠাট্টাটা হত। কিছু মজার গল্পটল্প, অনুরাগ বিরাগ কি

অভিমান—সবই ছিল। সব। অথচ সেই সুষমা বদলে গেছে কত। এখন যতবার কাছাকাছি হন কমলাপতি আর সুষমা; ঘুরে ফিরে একটা কথাই ওঠে। সংসারেব কথা, অভাব অনটনের অভিযোগ। এটা নেই। ওটা চাই। প্রত্যহের এই অনটন নিজের জীবনের ব্যক্তিগত সুখটুকু পর্যন্ত কেমন করে কেড়ে নিচ্ছে। মায়া মমতার বোধটুকু পর্যন্ত লোপ পাচ্ছে।

'কতবার বলেছি তোমাকে ,' কমলাপতি শেষ টান দিয়ে বিড়িটা ছুঁড়ে দিলেন মেঝেয়; 'এ-সব কথাটথাগুলো সময় বুঝে বলবে। সারাটা দিন তো পড়ে থাকে, তখন বলতে পাব···'

'পারি।' সুষমা খানিক আগে তার ডান হাতটা কমলাপতিব কোলেব কাছে রেখেছিল, এখন সে-হাতটা সরিয়ে আনল। 'কতক্ষণ তুমি বাড়িতে থাক সারাদিনের মধ্যে ? · তা ছাড়া আমারও পাঁচটা কাজকর্ম থাকে···'

'কী এমন কাজকর্ম তোমার, আমি তো বুঝি না!' কমলাপতির গলায় অদ্ভুত ক্ষুব্ধতা এবং বিরক্ত মাখানো অল্প ঝাঁঝাল সুব।

'তুমি তা দেখবে না, জানি।' সুষমা পড়ে যাওয়া আঁচল টানল বুকের ওপর, পরনের কাপড় চোপড় ঠিক করে উঠে বসল, 'এখন তুমি অন্ধ হওয়ার মত।'

'তাই তো চাও তুমি। আমি মরলে টরলে কি অন্ধ অথর্ব হলে তোমার ভাল হয়, জানি··' অত্যন্ত অস্বাভাবিক রূঢ় গলায় বললেন কমলাপতি। 'আমার চাইতে টাকাটাই তোমার কাছে বড়।'

'তাতো বলবেই। তোমার মুখে এখন কিছুই আর আটকায় না···'

'তোমারই বুঝি আটকায় ?'

'না, আমার মুখেও আটকায় না। কেন যে আটকায় না সে-কথা ভেবে দেখেছ কোনোদিন...' সুষমার গলা বর্ষার বাতাসের মত ভেজা ; বসে-যাওয়া সর্দির মত স্বর। যেন সুষমা নিজের মধ্যেকার চেপে রাখা এক আগুনের হলকাকে আরও চাপতে চাইছে প্রাণপণে।

কমলাপতি তক্তপোষ থেকে নামলেন। শব্দ করে একটা বিড়ি ধরালেন। জল খেলেন এক গ্লাস। তারপর সরে গেলেন জানলার কাছে। রাগ এবং বিরক্তি-চাপা তীব্র এক অস্বস্তি অনুভব করছিলেন কমলাপতি ; তা চেপে থাকলেন। সুষমাকে এখন আর সহ্য করতে পারছিলেন না কিছুতে। সুষমার চোখের জল, তার গলা, কথা বলার ধরন—মায় তার উপস্থিতি পর্যন্ত প্রবল জ্বরের তাপের অস্বস্তির মত। অত্যন্ত কুশ্রী বীভৎস্য এবং নোংরা মনে হচ্ছিল সুষমাকে। যেন কমলাপতি চাইছিলেন, সুষমা এখন চলে যাক ঘর ছেড়ে। ওর দেহের গন্ধে বিশ্রী এক উৎকট অস্বস্তি ; অসহ।

সত্যি কাঁদল সুষমা। জোরে শব্দ করে কি হুতাশ ছড়িয়ে নয়। হেঁচকি তোলার মত অল্প চাপা একটু শব্দ থেকে থেকে উঠছিল। সামান্য-স্পষ্ট নিশ্বাসের দ্রুত অথচ মৃদু কাঁপুনির শব্দটুকু শুনতে পারছিলেন কমলাপতি। একবার ফিরে তাকালেন। এক মুহূর্ত। টালি-খসা ছাদ, সেই খসা-টালির ফোঁকর গলে আসা আলো সুষমার কাঁধের একটা অংশ ছুঁয়েছে। বাকিটুকু ছড়িয়ে পড়েছে বিছানায়। সেই আলোয় সুষমার মুখের খানিক দেখা যাচ্ছে। বাঁ-দিকের গাল, চোখ, কপালের এক তৃতীয়াংশ ; ডান চোখের অর্ধেক কি তারও কম, গালের রেখা ছাড়িয়ে উঁচু নাকের খানিক—তার টানা রেখাটা পর্যন্ত। শাড়ির

আঁচল মুঠো করে ধরে চিবুকের তলায় রেখে সুষমা তার মুখটা সামান্য ঝুঁকিয়েছে। এলোমেলো বিপর্যস্ত ক-টা চুল কপাল গাল এবং কানের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে নেমেছে। সুষমার কান্নার শব্দ অতি মৃদু নরম, অল্প ফোঁপান অথচ যেন অস্বস্তিতে ভরা। এখন অতি দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ তুলছে ; বেখাপ্পা এবং অত্যন্ত খাপছাড়াভাবে।

সামান্য নড়লেন কমলাপতি। বুঝি দু'পা পিছিয়ে যেতে গিয়ে আরও একটু সরে এলেন।

সুষমার ভেজা চোখ, গাল চিবুক, শাড়ির আঁচলে বার বার নাক-মোছা এবং এই মৃদু কান্নার ধরণটা দেখলেন কমলাপতি। ঠোঁট ফোলার একটু আভাষ, নাকের পাটার কাঁপুনি পর্যন্ত।

এই ছোট ঘরে অস্বস্তিতে মরছিলেন কমলাপতি। রাগ দুঃখ ক্ষোভ বিতৃষ্ণা আর অভিমান সব মিলিয়ে কমলাপতি অত্যন্ত রূঢ় এবং কঠিন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। কুৎসিৎ ধরণের এক গন্ধও যেন তার ধৈর্যকে পীড়ন করছে। নারকেলের তেল-মাখা ভেজা চুলের ভ্যাপসা গন্ধ। কিংবা, তাও নয়, ঘামে ভেজা কোনো স্ত্রীলোকের গা-য়ের। এই গন্ধ কুৎসিৎ এবং বীভৎস অনুভূতির জন্ম দিচ্ছিল কমলাপতির মনে।

…এই খানিক আগে—কতক্ষণ আর হবে, আমি সুষমাকে চাইছিলাম। ও আসবে এই কথা ভেবে আমার মন অস্থির হয়ে উঠছিল…এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় আমার রক্ত ফুটতে চাইছিল, শুকিয়ে আসছিল গলা…তারপর… কমলাপতি ভাবছিলেন। বুঝি আনুপূর্বিক ঘটনা গুছিয়ে নিয়ে নিজের মনকে জিজ্ঞেস করছিলেন…অন্ধকার দেওয়াল থেকে টিকটিকি ডেকে উঠল একটা, কমলাপতির ভাবনাটা ছিঁড়ল হঠাৎ।

ঘুমের আমেজ গাঢ় হয়ে এসেছিল, আচমকা এক শব্দে কমলা প্রায় চমকে জেগে উঠল।

'কে!' ভয় জড়ানো গলায় কমলা প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল কিন্তু শব্দটা ফুটল না তত জোরে।

'আমি।'

'নীহার?'

'হ্যাঁ।'

নীহারের গলা কেমন অস্বাভাবিক লাগল কমলার কাছে। যেন ভয় পেয়ে নীহার ছুটে এসে ঘরে দাঁড়িয়েছে এই-মাত্র। হাসফাঁস করে দ্রুত নিশ্বাস টানতে টানতে কথা বলছে।

'কোথায় গিয়েছিলি, বাথরুমে?'

'হ্যাঁ।' কমলা আর পারুলের মাঝখানের জায়গায় এসে বসল নীহার। বসেই রইল খানিক।

মশারীর ভেতরে মশা ঢুকেছে কয়েকটা। কমলার কানের কাছে উড়ছে। পিনপিন শব্দ। ঘাড়ের কাছে নেমে এল শব্দটা। সামান্য সুড়সুড়ি লাগল গলা আর ঘাড়ের মাঝামাঝি জায়গায়। মশাটা মারবার জন্যে মোটামুটি অনুমান করে জোরে একটা থাপড় বসাল কমলা। অল্প ভিজে মতন লাগল আঙুলের গোড়ার দিকে। মশাটা মরল বুঝি।

ঘুমের ঘোরে কি যেন বলল পারুল। নড়ল চড়ল; তার শব্দটুকু পর্যন্ত শুনতে পেল কমলা।

'বসে রইলি যে বড়?' নীহারকে তাড়া দিল কমলা, 'শুয়ে পড় না।'

চুপচাপ বসে রইল নীহার। শু'ল না।

আরেকটা থাপড়ের শব্দ উঠল। মশা মারল বুঝি নীহারই।

'কেমন করে যে ঢুকিস, এক গাদা মশা ঢুকালি' ··অত্যন্ত অপ্রসন্ন গলায় বলল কমলা, 'দেখতো, পারুলটাকে বুঝি

খাচ্ছে।' হাত দু'টো দিয়ে বালিশ আঁকড়ে, মুখ গুঁজে, কান চাপা দেওয়ার মতন করে শুল কমলা। হঠাৎ তার চোখ পড়ল দরজায়।

'দরজাটা বন্ধ করিস নি?'

'না।'

'কি যে করিস বুঝি না! আবার তো বেরুবি; —এমনিতে মশার জ্বালায়…'

'কী করে বন্ধ করব?' নীহারের গলায় সামান্য উষ্মা। 'খোলাই তো ছিল।'

'খোলা ছিল!' বিস্ময়ের সুরে কমলা বলল, 'বোধ হয় বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল মা।'

'মা নেই।' অত্যন্ত খাটো গলায় বলল নীহার, 'ও-ঘরে… বাবার ঘরে।'

কমলা চুপ করল। নীহারও কথা বলল না আর। খানিক।

বার দুই হাওয়ার আচমকা ঝাপটায় মশারীটা নড়চড়ে উড়ল। দরজার পাল্লা দু'টো অল্প ভেজানো ছিল—এখন হাওয়ার ঝাপটায় হাট হয়ে গেছে। এ-ঘরের অন্ধকার অল্প পাতলা হল।

খানিক বসে থেকে শুয়ে পড়ল নীহার। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল।

কিছু আগে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল নীহারের। নড়তে চড়তে গিয়ে খোলা দরজাটা চোখে পড়েছিল। চমকে উঠে আস্তে গলায় দু'বার সুষমাকে ডেকেছিল নীহার। কিন্তু জবাব পায়নি। শেষকালে পারুলকে ডিঙিয়ে মা-কে ছুঁতে গেল নীহার। মা নেই। দরজা খোলা। মা নেই…নীহার কিছু সময় ধরে ভাবল। অপেক্ষা করল। সুষমা বাইরে গেলে ফিরত এতক্ষণে। কিন্তু কেন আসছে না! নীহার

উঠল। বাইরে গেল। বাথরুমে নয়, ও-ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল খানিক।

একটা জোনাকি ঢুকেছে ঘরে। বুঝি দমকা হাওয়ার সঙ্গে ঢুকে পড়েছে। মশারীর গা-য়ে বসল এইমাত্র। ফিকে সবুজের একটু ভাব মেশানো হলদে-আলো জ্বলছে জোনাকির। জ্বলছে, নিভছে, জ্বলছে···নীহার অপলক চোখে জোনাকি আলোর এই জ্বলা নেভা খেলা দেখছিল। দেখল অনেকক্ষণ ধরে। যেন, এই ঘরের অল্প ফিকে হয়ে আসা অন্ধকারে এই আলোর রঙটুকু তার ভালই লাগছিল।

এই আলোও এক সময় বিরক্তিকর লাগল নীহারের কাছে। ঘুম আসছে না। একটু ছটফট করল নীহার। শেষ পর্যন্ত ডাকল কমলাকে।

'দিদি, এই দিদি ; ঘুমোলি নাকি ?'

'কেন ?' কমলা সাড়া দিল।

'মা কাঁদছে।'

'কাঁদছে!' কমলা উঠে বসল সঙ্গে সঙ্গে। কেমন এক শংকা, বিস্ময়ের ভাব এবং এক প্রশ্ন তার চোখে জড়াল।

নীহারও উঠে বসল, 'হ্যাঁ, বাবার ঘরে। আমি শুনতে পেয়েছি।'

আর কথা নেই। দু' বোন প্রায় পাশাপাশি কাছাকাছি বসে। অনড় অবিচল স্থির, পাথরের মূর্তির মতন স্তব্ধ।

মশারীর গা থেকে উড়ে গেছে জোনাকি। ঘরে ঘুরছে উড়ে উড়ে। আলো জ্বালাচ্ছে থেকে থেকে। মুখে শব্দ নেই দু' বোনের। কাঠ কি পাথরের মত জড় দু'টি স্তব্ধ মূর্তি একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে না। ওরা এই আলোবিন্দুর খেলা দেখছিল। বন্দী জোনাকির উড়ে উড়ে এই চক্কর খাওয়া।

পাঁচ

এ-ঘরে নীহাব নেই এখন ; পারুলও নয়। কমলা আর সুষমা আছে। কথা বলছে।

মেঝের কোণের দিকে গুটিয়ে রাখা তোলা-বিছানার পাশে পা ছড়িয়ে বসেছে কমলা। একটা নীল মত কাপড়ের অংশ তার হাতে। চোখও সেই দিকেই। ডান হাতটা নড়ছে কমলার। কমলা সেই ফ্যাকাসে হয়ে আসা নীলরঙের টুকরোটা সেলাই করছে। লাল কালোর ফুটকি ফাটকি দেওয়া একখণ্ড ছিট কাপড় দিয়ে তালি লাগাচ্ছে। এই খণ্ড কাপড় সম্ভবত পুরনো কোনো ব্লাউজের অংশ কিংবা সায়ার। আধ-কুঁজো মানুষের মত কমলার পিঠ অনেকটা বেঁকে গিয়ে ঝুঁকেছে সামনের দিকে। ঘাড় থেকে মাথাটাও নেমেছে সামান্য; ঝুলে পড়ার মত। অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে একাগ্রভাবে সেলাইয়ের কাজ করছে কমলা। আর সেই অবস্থায় চোখ মুখ না তুলেই কথা বলছে সুষমার সঙ্গে।

কি একটা কথা বলছিল কমলা, সুষমা তার জবাব দেয়নি সঙ্গে সঙ্গে। ঝরক্ ঝরক্ করে বার দুই চাল ঝাড়া দিল কুলোর, তারপর মেঝেয় নামাল কুলোটা। কুলোর মাথার দিকে সরে-যাওয়া-চালের খানিক চার আঙুলের মাথায় সামনের দিকে টেনে ছড়িয়ে নিল। তারপব আঙুল দিয়ে নেড়ে নেড়ে কাঁকড় খুঁজতে লাগল।

'তুই না হয় লিখে দিস এক ফাঁকে। ওরা তো আর খোজখবর নেয় না, ··আর নেবেই বা কি···' সুষমা কুলো তুলে আর একটা শব্দ করল নাড়ার। মাথার ওপর থেকে খসে পড়া আঁচলের অংশ কাঁধ থেকে বাঁ-হাতে তুলে মাথায় দিল,

'…মানুষের দুঃখের দিনে এমনি হয় ; আত্মীয় স্বজন পর্যন্ত পর হয়ে যায়…' সুষমা থামল। শেষ করল না কথাটা। যেন হঠাৎ দম আটকা একটা ভাব তার গলা বুজিয়ে দিল ; বাকি কথাটুকু গলা পেরিয়ে উঠে আসতে আসতে আটকা পড়ে আবার তলিয়ে গেল।

'পিসিমাকে তুমি দোষ দিও না, মা। কী ক্ষমতা আছে পিসিমার ? সারা বছর ধরেই তো বিছানা আর বিছানা…'

'তোর পিসিকে কিছুই বলিনি আমি। বাড়িতে কি সে একলাই লোক ? সনৎটা করে কি ?…'

'সুনুদার কথা আবার ধরছ তুমি ?' কমলা তালির দ্বিতীয় পাশের সেলাই শেষ করে আঙুল দিয়ে চেপে দিল সেলাইয়ের জায়গাটা। তারপর ঘুরিয়ে অন্য পাশটা ধরল। 'ও কি কথা শোনে নাকি পিসিমার, দিন রাত তো শুধু…' কমলা নিচু করা মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে সুষমার দিকে তাকাল এক মুহূর্ত।

খুব সামান্য পলকা মত এক শব্দ হয়েছিল ; হঠাৎ চুড়িতে চুড়িতে জোরে ঠোকাঠুকির মতন। কমলার মনে হল মা-র হাতের শাঁখাটা বুঝি বাড় হল।

একগাছা চুড়ি আর শাঁখাটা কুলো ঝাড়া দেবার সময় হরহর করে নেমে এসে কব্জি ছাড়িয়ে প্রায় বুড়ো আঙুলের গোড়া ছুঁই ছুঁই হতেই, কুলোর গোড়ার গুঁতোয় ঠুন্ ঠুনুং করে শব্দ বাজল। হাত থেকে কুলো ফেলে দিয়ে সুষমা শাঁখাটা দেখল। তারপর কব্জি ছাড়িয়ে ওপরের দিকে তুলে দিল।

আগে কব্জিতেই আঁটসাঁট থাকত চুড়িগুলো ; এখন ঢলঢলে হয়ে গেছে। নাড়াচাড়া পড়লে কি জোরে হাত নাড়লে শাঁখা, চুড়িগুলো কব্জি ছাড়িয়ে নিচে নেমে আসে।

দোরগোড়া থেকে সামান্য সরে এসে চাল নিয়ে ঝাড়তে

বাছতে বসেছে সুষমা। রেশনের কম-দামী চাল এখন আসছে বাসায়। অন্তত মাস তিনেক ধরে। বেঁটে মোটা-মতন এই চালগুলোয় যেমন কাঁকড় তেমনি খুঁদ আর কুঁড়ো মেশানো। বোটকা এক দুর্গন্ধ চালে। তবু এই চালই এখন ভরসা। প্রথম প্রথম বেশ কষ্ট হয়েছে এই চাল খেতে। কমলাপতির কথা ভেবেছে সুষমা, এই লোকটি মোটামুটি শৌখিন ছিল এক সময়। চাল-চলনে খাওয়া-খাদ্যির ব্যাপারে একটা বিশেষ রকমের রুচি ছিল। পেটের রোগটোগ থাকায় মোটা চাল টাল কি রুটি একেবারেই সহ্য হয় না। এখন এই মোটা, বর্মা না কোথাকার চাল পর্যন্ত জোটাতে কত কষ্ট। তাও দু'বেলা নয়। চালের দাম বেশি। বিকেলের দিকে আজকাল রুটিই চালাতে হচ্ছে।

চালের কথা ভাবতে বসে সুষমার কি মনে হল, দরজা ডিঙিয়ে উঠোনের দিকে তাকাল একবার।

বারান্দার কোণ ঘেঁষে দিন শেষের খানিক রোদ ছিল। কুয়োপাড়ের দিক থেকে কাঁঠাল গাছের ছায়াটা তির্যকভাবে পড়েছিল উঠোনে। আর বাকিটুকুর প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে এতক্ষণ উজ্জ্বল আভা ছিল রোদের—এখন নেই। বারান্দার কোণ থেকে সরে গেছে রোদ, উঠোন জুড়েও প্রায় ছায়া। কেবল পাতার চিকরির ফাঁক টাক দিয়ে নানা আকারের একটা দু'টো রোদের ফুটকি ফাটকা দেখা যাচ্ছে।

বেলা পড়ে এসেছে, বুঝল সুষমা। বুঝি বারান্দার ক্যানেস্তারার ছাউনি ডিঙ্গিয়ে আকাশের দিকেও তাকাতে চাইল। কিন্তু পারল না। সামনে রুমাদের ঘর। ক্যানে-স্তারার ছাউনিটাও এত নামানো যে, ঘরে বসে একফালি আকাশের ছবি পর্যন্ত দেখার পথ নেই!

কমলাপতি সেই সকালে বেরিয়েছেন। দুপুরে তাঁর

ফিরবার কথা। প্রায় রোজই ফেরেন তাই। কিন্তু আজ দুপুর গেল, বিকেলও গড়াচ্ছে—লোকটার আর পাত্তা নেই।

খানিক এলোমেলো একটা দু'টো ভালমন্দ চিন্তা এল মাথায়। সুষমা চোখ ফিরিয়ে তাকাল মেয়ের দিকে। কমলার দিকে। কমলা পারুলের ইজেরটা নিয়ে বসেছে। সেলাই করছে।

সামান্য ব্যস্ততা যেন অনুভব করল সুষমা। হঠাৎ কেমন করে উঠল মন; চঞ্চল হল সামান্য। শাড়ির পাড়টা পা পর্যন্ত টেনে দিল, আঁচল ঠিক করল আবার। তাকাল কমলার দিকে।

'তোর হল রে কুমু?'

লম্বা ফোঁড় শেষ করে, সুতো টানতে গিয়ে জড়িয়ে গিঁট বেঁধে গিয়েছিল, কমলা অতিশয় ব্যস্ততা নিয়ে গিঁট খুলবার চেষ্টা করছিল। সুষমার গলা শুনে সূঁচের নিচের দিকটা দু' আঙুলে ধরে সুষমার দিকে তাকাল।

চাল-কুলো ফেলে সুষমা উঠি উঠি করছিল।...'তোর হয়নি ওটা?'

'না।' কমলা মা-র এই হঠাৎ প্রশ্নে অল্প অবাক হল।...'কেন?'

'হলে না হয় তুই একটু বসতিস। বিকেল হয়ে এল...'

'একটুখানি বাকি আছে।' গিঁট খুলে কমলা সুতো টানল, 'যা ছিঁড়েছে পারুলটা....'

'ওকি আর ইচ্ছে করে ছিঁড়েছে,' সুষমা কমলার কথাটা ঠিক প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতে না পেরে প্রতিবাদ জানাল, 'ওটা কি আর আজকের ইজের...'

'তাই বলে এমন করে ছেঁড়ে নাকি? এই দেখ না—,' কমলা ইজেরের তালিটা তুলে ধরে সামান্য বাড়িয়ে দিল

হাতটা। 'পচলে বড় জোর ফেঁসে টেসে যায়···আর এই ছোঁড়ার ঢংটা দেখনা একবার। গেছো মেয়েদের মতন · '

'থাক ;' কথাটা চাপা দিতে চাইল সুষমা কিন্তু চেষ্টা করেও চাপতে পারল না কিছুতে।···'তোমরাই বা কি ? সাত আট মাসে তিন তিনখানা শাড়ি তোমরা বাড় করলে '

'আমি করিনি মা, তুমি দোষ দিওনা আমাকে।' কমলার গলা ঈষৎ দৃঢ়, সামান্য গম্ভীর।

'তবে কি আমি করেছি ?' অধৈর্যের ভাব প্রকাশ পেল সুষমার কথায়।···'পড়ছ তোমরা দু'বোনে, দোষটা কি আমার ঘাড়ে চাপাতে চাও ?' অধৈর্যতায় বিকৃত এক ভাব সুষমার চোখেমুখে প্রকট হয়ে উঠছিল।

আর কোনো কথা বলল না কমলা। নিশ্চুপ। স্থির অথচ অল্প অবাক ভঙ্গিতে বিস্ময়-চোখে কমলা সুষমার দিকে তাকিয়ে রইল খানিক। সুষমার চোখমুখের ভাব, তার গলা এবং অধৈর্যতাটুকু পর্যন্ত অত্যন্ত মনযোগের সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখল। সুষমার ঘাড়ের কাছে একটা শিরা দপদপ করে নড়ছে। মা-র বিবক্তিটুকু ধরতে পারল কমলা।

কথা বন্ধ হল দু' জনের। মা আর মেয়ের।

সুষমা আবার কুলোটা তুলে নিল হাতে।

স্তব্ধতায় খানিক সুষমার দিকে তাকিয়ে থেকে কমলা আবার সেলাইয়ে মন দিল। সেলাইটা এবাব শেষ করবে সে।

সন্ধ্যাদের ঘরে গিয়েছিল পারুল, এইমাত্র ছুটে এল প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে।

সুষমা মুখ তুলে একবার দেখল, দেখে ঘাড় নিচু করে কাজে মন দিল।

মা-র মুখ দেখে এবং তার এই বিরক্তিমাখানো চাউনির

ভাব লক্ষ্য করে একবার চোকাটের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল পারুল, এবার সরে এল কমলার কাছে; পাশে বসল হাঁটু মুড়ে।

সেলাই থেকে চোখ তুলল কমলা। তাকাল পারুলের দিকে। মুখ ঘুরিয়ে। অত্যন্ত ধীর স্থির ভাব, সামান্য গাম্ভীর্যের মধ্যেও একটু প্রশান্তির ছায়া কমলার মুখে।

পারুলের মধ্যে হাঁপধরা ভাবটা তখনও রয়েছে। কি বলতে গিয়ে ঢোঁক গিলল পারুল। কমলার চাউনি দেখে মনে মনে আস্বস্ত হল।

'ওরা সিনেমায় যাচ্ছে, দিদি,' মুখ তুলে কমলার দিকে তাকিয়ে রইল পারুল।

'কা-রা ?'

'সন্ধ্যাদিরা।'

কমলার মুখের রেখাগুলো আস্তে বদলাতে লাগল। পারুলের হাসি খুশী এবং এই ক্ষণিক আনন্দের সুন্দর প্রকাশটুকু মুগ্ধ চোখে দেখল কমলা। দেখতে দেখতে শান্ত বিনম্রতা এক করুণ ছায়ার রূপ নিল। কমলার সারা মুখে এক বিষন্নতা নামছে। অত্যন্ত ফাঁকা মনে হচ্ছে মন। আর বুকের কোথায় যেন তীব্র এক বেদনা টনটন করছে। ভয়ানকভাবে।

মাথা নামাল কমলা। তার ভঙ্গি অত্যন্ত হতাশ বিষন্ন এবং বিব্রত। মুখ নামিয়ে কমলা নিজের ভাব ভঙ্গিটুকু ঢাকতে চাইল। মুখ থেকে মুছতে চাইল বেদনাবোধের ছায়া।

সুষমা হাতের কাজ ফেলে, কুলোটা নামিয়ে পারুলের দিকে তাকাল। তার চোখের দৃষ্টি তীব্র, মুখের ভাবে অসম্ভব রূঢ়তা।···'যাচ্ছে তো হয়েছে কী ?'···রুক্ষ ঝাঁঝাল গলা সুষমার।

পারুল চমকে উঠল। ভয় পেল মা-র গলা শুনে। এক পলক তাকাল। তারপর আরও সরে এল কমলার দিকে।

বাস্তবিক মা-কে এখন ভয় পায় পারুল। মা-র চোখ মুখ চেহারা, তার কথা বলার ভঙ্গি ; এই শাসানো গলা—সব মিলিয়ে এই ভয়ের কারণ। এখন আর মা-কে ভাল লাগে না পারুলের।···কেন এমন হয় ? মা ভালবাসত আমাকে, কোলে নিয়ে আদর করে কত কি কথা বলত ; দুধের বাটি নিয়ে কতদিন মা আমাকে সেধেছে। মাথায় হাত বুলিয়ে, চিবুক নেড়ে, চুমু খেয়ে দুধ খাইয়েছে মা। কখনও রাগ করেনি। এই মা কত সুন্দর ছিল। কি শান্ত স্থির। অথচ পারুল অবাক হয়ে ভেবেছে, মা-কে লক্ষ্য করেছে চুরি করে, চুল চুল বিচার করে দেখেছে ; মা বদলে যাচ্ছে। ভয়ানক রকমের বদল। এখন মা আদর করে না। হাসে না আগের মতন সুন্দর করে। আর দেখতে কি খারাপ হয়েছে যে, পারুলের কেন যেন থেকে থেকে মনে হয়, এই মা আমার নয়। আমাদের নয়। দিদির, আমার, মেজদির কারও না। বরং এখন কথায় কথায় চড়া গলা শোনা যায় মা-র। কারণে অকারণে মা ক্ষেপে যায়। কথায় কথায় যেমন কাঁদে, তেমনি হাত তোলে পারুলের গা-য়ে। মাকে এখন ভাল লাগে না পারুলের।

মা-র গলা শুনে চমকে সরে এসেছিল পারুল। কমলার গা-য়ে। কমলা ইজেরটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে পারুলকে ধরল।

'তুই কেন গিয়েছিলি ওদের ঘরে ?' কমলা শুধলো আস্তে গলায়। সামান্য হাসি তার ঠোঁটের ডগায় নড়ল।

'মেজদি ডেকেছিল।' পারুল একবার সুষমার দিকে চোখ বুলিয়ে এনে চোখ বন্ধ করল। আবার তাকাল হঠাৎ। ইজেরটার দিকে।

'ডেকেছিল! কেন ডেকেছিল তোকে?'

'জল চেয়েছিল মেজদি।'

'কেন, সে নিজে নিয়ে খেতে পারে না?'

চুপ করে গেল পারুল। সে বুঝতে পারছিল দোষটা অযথাই মেজদির ওপর চাপাচ্ছে সে। আসলে মেজদিরই বা দোষটা কিসের? এখন দিদির কথা শুনে ক্ষেপে উঠবে মা, মেজদিকে ডাকবে, বলবে, 'হাজার দিন না তোমাকে বারণ করেছি আমি। দিন নেই, রাত নেই, কিসের অত ফিসির ফিসির গুজুর গুজুর, শুনি?' গলার স্বর চেপে মা বলবে, 'ওই মেয়েটার স্বভাব চরিত্র…' চাপতে চাইলেও মা-র গলা চাপা শোনাবে না। শোনায় না। আজকাল ছোট করে, আস্তে করে কথাই বলতে পারে না মা।

'কী করছেন উনি সেখানে?' সুষমার তিক্ত বিরক্ত গলার স্বর শুনে আরও ভয় পেল পারুল।

'কিছু না, এমনি…' থতমত খেয়ে পারুল শেষ করতে পারল না কথাটা।

মা চটেছে, বুঝতে পারছিল কমলা। ভয়ানক রেগে গেছে মা। হয়তো এখনই নীহারকে ডাকবে। গালাগাল করবে ডেকে। পারুলের হাত ধরে কমলা উঠে দাঁড়াল। তাকাল সুষমার দিকে।

সুষমাও তাকাল। বিরক্ত অপ্রসন্ন তার মুখ।

'তোকে না কুলোটা ধরতে বললাম একটু?'

'ধরছি।'

'কখন, আমার ঝাড়া শেষ হয়ে গেলে?'

একটু চুপ। কমলা কথা বলল না। পা বাড়িয়ে যাই যাই করেও যেতে পারল না। পারুলের হাত ধরে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল কমলা।

নীহারকেই ডাকতে যাচ্ছিল কমলা। মা আরও চটে ওঠার আগে তাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত। ভেবে কমলা পা বাড়িয়েও দাঁড়িয়ে গেল। ঝড়ের আশংকায় কমলার বুক কাঁপছিল।

'নীহারকে ডেকে আনছি আমি। বিকেল হল···' বলতে বলতে কমলা তু-পা এগুল। দরজার দিকে। তারপর দরজা ডিঙিয়ে বাইরে পা দিয়ে হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচল।

'শাড়িটা সুন্দর ম্যাচ করবে তোর গায়ে···' আঁচল হাতে তুলে তু' আঙুলের ফাঁকে অল্প ঘষল নীহার,···'রংটা বেশ।'

'ধুর, তোর যেমন পছন্দ! কেমন ক্যাটকেটে ভাব দেখ না।' সন্ধ্যা সামান্য ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিল, অল্প ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল নীহারের দিকে। সন্ধ্যার দাঁতে চাপা শাড়ির একটা অংশ। ওপরের আঁচলাটাই। এই অংশে সন্ধ্যার বুকের খানিক ঢাকা। গা-য়ে জামা নেই সন্ধ্যার। পিঠ একেবারে উদোম আলগা খালি। একেবারে কোমর পর্যন্ত। বুকের সামান্য অংশই যা ঢাকা। ঢাকা বলতে তেমন ঢাকাও নয়; নীহার প্রায় সবটাই দেখতে পাচ্ছিল সন্ধ্যার।

'তবে তুই কিনলি কেন?' নীহার সন্ধ্যার নতুন কেনা শাড়িটা হাতে তুলে নিল।

'আমি কি কিনেছি নাকি?' বাঁ-হাত উঁচু করে ছোট জামার হাতাটা গলাতে গলাতে কমলার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল সন্ধ্যা, 'বাবা কিনেছে। সে-দিন।'

'তোর পুজোর শাড়ি?' শাড়ির গন্ধ শুঁকল নীহার।

'হ্যাঁ।' সন্ধ্যা সামান্য ঝুঁকল ডানদিকে। জামার ডান দিকটা পিঠ ঘুরিয়ে টেনে এনে, কনুই ভেঙে হাত গলাল। পিঠ ঢাকা পড়ল সন্ধ্যার।

দাঁত দিয়ে চেপে ধরা শাড়ির আঁচল ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সন্ধ্যা। নিচের জামার একেবারে নিচের ফিতেটা উঠিয়ে টেনে বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে এল।

সন্ধ্যার ফিতে বাঁধার ভঙ্গিটুকু দেখল নীহার। এবং শরীর। 'এ-গুলো কেন পরিস তুই?' বিশ্রী লাগার মত ভঙ্গি করে কমলা শুধলো।

'কেন?' দ্বিতীয় ফিতেয় গিঁট বাঁধতে গিয়ে চোখ তুলল সন্ধ্যা। খানিক বিস্ময় এবং প্রশ্ন তার চোখে।

'বড্ডি খারাপ হয়।···বিলিতীগুলো কিনলে পারিস।' নীহারের গলার স্বর চাপা, ফ্যাসফেসে।

'তোরা বুঝি পরিস?' সন্ধ্যা নিচের জামা-পরা শেষ করে শাড়িটা কোমর থেকে ছেড়ে দিল।

'পরতাম।' নীহার সায়া আর ছোট জামা পরা সন্ধ্যাকে দেখছিল। এবং সন্ধ্যার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অপ্রস্তুতের মত অল্প হাসল, 'আমি আর দিদি।'

'তোর মা?' সন্ধ্যা ব্লাউজের নিচের দিকটা সায়ার বাঁধনের তলায় গুঁজছিল।

'ধ্যেৎ, তুই যেন কি একটা। মা কেন পারবে? ছেলেপুলে বড় হলে হাতে তৈরি জামা পরে সকলে···' বলতে বলতে নীহার দরজার দিকে একবার তাকাল।··'তোকে এখন বেশ লাগছেরে সন্ধ্যা। কেমন যাত্রার দলের সখী সখী।'

'হেস্।' ভ্রূ কপাল কুঁচকে ছোট করে ধমক দিল সন্ধ্যা। 'জানিস···' শাড়ির পাট ভাঙতে ভাঙতে সন্ধ্যা নীহারের দিকে সরে এল একটু। 'রুমা বৌদির আছে। আমিও কিনব একটা···'

একটুক্ষণ চুপচাপ। দেওয়াল কি ছাদের কোথাও থেকে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল। অদ্ভুত লাগল নীহারের কাছে।

শাড়ি পরছে সন্ধ্যা। সামনের দিকটা কুঁচি দিয়ে গুঁজছে কোমরে। নতুন শাড়ির কেমন এক খস্‌খস্‌ শব্দ। নীহার নতুন শাড়ির সুন্দর গন্ধ পাচ্ছিল।

শাড়ি পরা শেষ করে সন্ধ্যা পেছন দিকের পাড়ের দিকটা গোড়ালিতে চেপে নামাল। তারপব ছাড়া শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘসে ঘসে মুখ মুছল, 'তুই চলনা নীহাব, এক সঙ্গে বেশ····'

'না-রে, পরে একদিন যাব,' বিষণ্ণ গলায় বলল নীহার। 'ভয়ানক রাগ করে মা। তা ছাড়া···' নীহাব থামল।

'তা ছাড়া আর কি ?'

'তোরা ছু-জনে যাচ্ছিস···' চিবুকের তলার ঘাম মুছল নীহাব। হাসল অল্প।

নীহারের কথা এবং তাব অল্প হাসিব অর্থটা ধবতে পাবল সন্ধ্যা।

'আমরা কি নতুন যাচ্ছি নাকি ?' এক গর্বেব ভাব সন্ধ্যাব কথায়।···'কতবার গেলাম।'

'অত পয়সা পায় কোথায় বে অখিল! তুই যে বলিস চাকরি হচ্ছে না।'

'জানিনা অত।' সন্ধ্যা নিচের ঠোঁট বাড়িয়ে অদ্ভুত এক ভঙ্গি কবল।··'আমার সিনেমা দেখা নিয়ে কথা···'

'রুমা বৌদি জানে না ?'

'না।' সন্ধ্যা কুঁচির ভাঁজ ঠিক কবল। কাঁধেব ওপরের আঁচলটাও।

নীহার দেখছিল সন্ধ্যাকে। তাব দৃষ্টিতে সামান্য মুগ্ধতা মিশেছিল, গন্ধটা ভাল লাগছিল নতুন শাড়ির—এখন সেই মুগ্ধতা কি গন্ধ কোনোটাই আর ভাল লাগছে না। নীহার নিশ্বাস ফেলল। শব্দ করে। তার মুখচোখে স্তব্ধ এক ছায়া,

বিষণ্ণতার অল্প ছাপ আর হতাশায় অত্যন্ত ম্রিয়মান দেখাচ্ছে। নীহার ভাবছিল অন্য কিছু। তার ভাবনাটা মোড় নিল।···

নিখিলের কথা মনে পড়ল নীহারের। মনে মনে অনেক কথা ভাবছিল নীহার। একদিন চলেই যাবে। মুখোমুখি দাঁড়াবে নিখিলের। পর পর দু'খানা চিঠিতে আসব আসব লিখল অথচ আর এল না। মনে মনে চিঠিতে কি লিখবে তার খসড়া করছিল নীহার। এবার নীহার লিখবে, ঠিক লিখে দেবে নিখিলকে···

নীহারের মনে মনে চিঠি লেখার খসড়াটাও ছিঁড়ল হঠাৎ। কমলার গলা শুনতে পেল নীহার। আর কার গলা? মনের স্তব্ধতা ভেঙে জেগে উঠল নীহার। দরজা দিয়ে তাকাল। কমলাপতির গলার স্বর। · বাবা ফিরল, মনে মনে বলল নীহার। ঘরে সন্ধ্যার চটির শব্দ। সন্ধ্যা বেরুবে এবার। বিমর্ষ হতাশ কেমন ফাঁকা ফাঁকা চোখ নীহারের। সেই ফাঁকা মন ফাঁকা চোখ আর এক ক্লান্তির ভারে প্রায় অবসন্ন ভঙ্গিতে নীহার সন্ধ্যাকে দেখল।

সন্ধ্যা বেরুল।

নীহার বাইরে, বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

কমলাপতি ফিরলেন এতক্ষণে। সঙ্গে নন্দও আছে।

কমলা পারুলের হাত ধরে সন্ধ্যাদের ঘরের দিকে আসছিল; কমলাপতিকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গেল উঠোনের মধ্যে।

পারুল কথা বলছিল। কি কি সব যেন। কমলা সব শোনেনি।

'আমি সিনেমায় যাব দিদি।'

'যাবি।' অন্যমনস্কভাবে বলল কমলা। একবার তার চোখটা নন্দর ঘরের দরজায় পড়ল।

ঘরে রুমাবৌদি নেই। দরজায় তালা ঝুলছে।

সামান্য বিব্রত বোধ করল কমলা; কপালের দু'পাশের শিরা দু'টো দপদপ করে উঠল। মাত্র কয়েকবার। আরও একটা অদ্ভুত বোধ বুকের তলায় কি কোথায় যে নড়ে উঠল ধরতে পারল না। অত্যন্ত ফাঁকা ধূ ধূ শূন্যতার মতন মনে হল চোখের সামনে। যেন আস্তে কাঁঠালতলার কুয়োপাড় থেকে এক হালকা কুয়াশার ঝলক উঠে এল। অত্যন্ত দ্রুততায় এগিয়ে এসে থেমে গেল সেই হালকা ধূসর কুয়াশার রাশ। এক পলক। তারপর সেই ধোঁয়া ছড়াচ্ছিল। অদ্ভুত গাঢ়তায় বদলে যাচ্ছিল কুয়াশার রূপ। কমলার চোখের সামনে ঝাপসা এক জগৎ···কিছু স্পষ্ট, অস্পষ্ট কিছু···তারপর অন্ধকার। অল্প, সামান্যক্ষণ রইল এই আঁধিয়া। কমলা বুঝতে পারল না সে চোখ বুজেছিল কিনা। এই ঝিমধরা ভাব তাকে অত্যন্ত পীড়িত করল, ক্লান্তি, বেদনার ভারে তার মাথাটা নুয়ে এল।

এই শালীনতা এবং স্বাভাবিক বোধটুকু মাঝে মাঝেই বিব্রত করে কমলাকে। মনের কোমল এক পর্দায় মৃদু তালে কাঁপে। সেই কাঁপার নাম অস্বস্তি। অস্বস্তির নাম যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা আগে ছিল না, এখন হয়েছে। এই নতুন বাড়ি, নতুন পরিবেশ, নিত্যকার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় কমলার মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অন্য এক কমলা মরছে। সুন্দর সুস্থ ছিল তার রূপ; এখন দৈনন্দিন অভাব, মা-বাবা মেয়েদের সম্পর্কের অল্প ভাঙনে তার রূপ পালটাচ্ছে। যেন দেওয়ালে ঝোলানো নতুন এক ক্যালেণ্ডারের ছবি ধোঁয়ায় ধুলোয় রৌদ্রে ছায়ায় মলিন হতে হতে এখন বিবর্ণ হয়ে এসেছে প্রায়। কমলা চোখের সামনে তার মনের ক্যালেণ্ডারের শুভ্র পরিচ্ছন্ন অকলঙ্ক নিখুঁত ছবিটিকে মলিন হতে দেখছে। এই মলিনতার রূপ শুধু নিজের মধ্যেই নয়,

জায়গা যত ছোট হয়ে আসছে, বাবা মা পারুল নীহার সকলের মনের সেই অদৃশ্য ছবির গা-য়ে ময়লা জমছে তত। মনও ছোট হয়ে আসছে।

উদাসের মতন এক ভাব ছিল কমলার মধ্যে, নন্দর ডাকে সেই ভাব কাটল।

'তোমার বৌদি কখন বেরুল, কমলা?'

ধূসর দৃষ্টি ছড়িয়ে তাকাল কমলা। ঠোঁট নড়ল তার,···· 'এই খানিক আগে।'

'একলা?'

একটু কি ভাবল কমলা; তাকাল নন্দর দিকে সোজা-সুজি। একহাতে বন্ধ-তালা ধরে রেখেছে নন্দদা, আলগা হাতে। তার মুখে চোখে অল্প কুঞ্চন, কেমন ছায়া—নন্দর মুখের রেখা দেখে কমলার মনে হল, সন্দেহ করছে নন্দদা। রুমা বৌদিকে।···'একলা, একলাই বেরিয়েছে,' কমলা বলল মৃদু গলায়। সত্য কথাটুকু এড়িয়ে যেতে খুব অস্বস্তি লাগছিল তার। আরও পরে কমলার মনে হল, পারুল মুখ উঁচু করে তাকিয়ে আছে তার দিকে বিস্মিত চোখে। পারুলও দেখেছে রুমাবৌদিকে বেরুতে।···একজন লোক ছিল। সে এসেছিল ভর দুপুরে। অনেকক্ষণ গল্প করেছে লোকটি রুমাবৌদির সঙ্গে। তারপর দু'জনে বেরিয়েছে। পারুল দেখেছে, কমলাও—কিন্তু এখন পারুলের মুখের দিকে তাকাতে কমলার ভয় করল।

বাড়ি ফিরে খানিক গুম হয়ে বসে রইলেন কমলাপতি। পর পর বিড়ি ধরালেন দু'টো। অত্যন্ত উদাসভাবে ছাদের দিকে তাকালেন, বিছানাটা দেখলেন, দরজা দিয়ে তাকালেন উঠোনে।

সূর্য ডুবেছে অনেক আগে। ম্লান ছায়ার মতন অস্পষ্টতা ছিল এতক্ষণ, সেই ছায়া গাঢ় হতে হতে এখন কালো রঙ ধরল। এই কালো রঙ অন্ধকার। মিহি এক আলোর ভাব জড়ানো রয়েছে এখনও। যেন কমলাপতি এই অন্ধকার চাইছিলেন···আরও গাঢ় হয়ে আসুক অন্ধকারের রঙ, সেই অন্ধকারের মধ্যে মুখ লুকবো আমি। আত্মগোপন করার এক দুর্বার ইচ্ছা জাগল কমলাপতির মনে।

অত্যন্ত হতাশ ভঙ্গিতে বসে রইলেন কমলাপতি। তাঁর দেহে মনে মুখে চোখে অসম্ভব রকমের ক্লান্তি। জীবন-যুদ্ধে পরাজিত এক মানুষের অবস্থা তাঁর। এতদিন তবু চলেছে, কায় ক্লেশে, কষ্টটষ্ট করে। সহায় সম্বল যা কিছু ছিল, বেচে টেচে সাফ করেছেন। ধার-দেনা হয়েছে কিছু; বাড়ি-ভাড়ার টাকাও ক-মাসের বাকি। আর দু'দিন পরে কি করে চলবে সংসার—যতবার এই কথাটা ভুলতে চাইছিলেন তত বেশি করে মনকে পীড়িত করছিল। এই মরা সংসারকে তিনি টানতে পারছেন না আর। এক দুর্বহ বোঝার মত ঘাড়ে চেপেছে। এই ভার নামানো যায় না, যায় না—কমলাপতি ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিউরে শিউরে উঠছিলেন। যেন অন্ধকারে নির্বিষ মৃতপ্রায় সাপের মত কুণ্ডলী পাকাতে ইচ্ছা করছিল তাঁব।

কমলাপতি জানেন তার ক্ষমতার কাল ফুরিয়ে এসেছে। এক সময় অশ্বত্থের মতন ছিলেন; সেই গাছে বাজ পড়ল, ডালপালা শুকিয়ে মরল সেই গাছ; এখন তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ভাজে ভাজে ঘুন ধরার অবস্থা। অত্যন্ত হতাশ বিষন্ন, অজ্ঞাত যন্ত্রণায় কাতর, গভীর ক্লান্তিতে অবসন্ন অবস্থায় শুয়ে রইলেন কমলাপতি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। সুষমা একবার ঘর ঘুরে গেল,

তাকাল, কিন্তু বলল না কিছু। পারুল খোঁজ করছিল বাবার, সুষমা তাকে ধমকে বারণ করেছে এ-ঘরে আসতে। সুষমার মুখ গম্ভীর। নীহার ঘরে এসে কি যেন খুঁজে আবার চলে গেল কি ভেবে—কমলাপতি তেমনিই শুয়ে রইলেন অন্ধকারে আড়াল হয়ে।

আরও সময় কাটল খানিক; কমলাপতি চুপচাপ শুয়ে সব কিছুই শুনতে পারছিলেন বাইরের। পারুল খাওয়ার বায়না ধরেছে। সুষমা ধমকাচ্ছে…নীহার কি যেন বলল… কমলা সান্ত্বনা দিচ্ছে পারুলকে। সুষমার কথার কি দোষ ধরেছিল কমলা, সুষমা হঠাৎ চটে উঠল…'নিজেদের পিণ্ডি নিজেরাই সেদ্ধ করে নিলে পার। কেন আর জ্বালাচ্ছ আমাকে। আর পারি না—ভগবান!' ধুপধুপ এক শব্দ শুনতে পেলেন কমলাপতি। সুষমা বুঝি বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল।

চটাস করে শব্দ হল আবার। আচমকা কেঁদে উঠল পারুল। 'নীহার!' কমলার গলা শুনতে পেলেন কমলা-পতি। '…বড় বার বেড়েছে তোমার; তুমি ওকে গা-য়ে হাত দেবার কে?'

'রাখ রাখ, দরদ দেখাতে হবে না অত', নীহারের গলায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ। 'গায়ে হাত দেবার অধিকার বুঝি তোর একলার?'

'অধিকার না থাক, তোর মতন শিয়রভাঙার স্বভাব নেই আমার…' কমলার গলার স্বর কাঁপছে। 'দু'বেলা দু' মুঠো পেট ভরে খেতে পায় না মেয়েটা; মারার বেলায় তোমরা ওস্তাদ…'

'খেতে কি তুই দিচ্ছিস নাকি?'

শুনছিলেন কমলাপতি। তাঁর বুকের কাছে কি যেন

দলা পাকাল। সেই দলা উঠে আসছে। চোখের কোণে ভেজা মতন লাগল। অল্প উষ্ণতা এই ভেজা ভাবে। কমলাপতি ছু'হাতে কান চেপে ধরলেন। এই কুৎসিৎ কদর্য কলরব থেকে মুক্তি চাইছিলেন তিনি।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিলেন, কখন তাঁর হাত কান থেকে সরে এসেছে। পা-য়ের শব্দ শুনলেন কমলাপতি। চোখ তুলে দেখলেন।

'বাবা,' কমলার গলা। 'খেতে এসো।'

কমলাপতি উঠলেন না। তাঁর শরীর এই বিছানার সঙ্গে আঁঠার মতন যেন আটকা পড়েছে। ছুপুর থেকে সমস্তটা সময় তিনি ঘুরেছেন। ঘুরে ঘুরে গিয়েছিলেন বড়বাজারের দিকে। খাতাফাতা লেখার কাজ যদি জোটে মাড়োয়ারীর গদিতে। তাও মেলেনি। এখন উঠে গিয়ে খেতে বসতে পর্যন্ত তার ইচ্ছে নেই। গলা শুকনো শুকনো কাঠ। যেন এই গলা দিয়ে পরাজয়ের ভাত নামবে না কিছুতেই, নামবে না···

উঠতে আরও খানিক সময় গেল, কমলা এল আবার, তারপর সুষমা।···'কী হল আবার?' সুষমার গলার স্বরে বিক্ষুব্ধতা। অত্যন্ত রূঢ় কর্কশ এবং ছুর্বিনীত গলা সুষমার। 'তোমাকেও কি সাত বার সাধতে হবে নাকি। কতটা রাত হচ্ছে—তেল পুড়ছে না?'

আর কথা বাড়ালেন না কমলাপতি। ক্লান্ত দেহ টেনে উঠে বসলেন। সুষমার দিকে তাকালেন না। অত্যন্ত অসহায় নির্বান্ধব মানুষের মত দাঁড়ালেন। যেন এই সংসারের কাছে সকলের ভাগ্যে ছুঃখ নেমে আসার জন্য তিনিই দোষী।

বারান্দায় লণ্ঠন জ্বলছিল। বেতের ছেঁড়া মতন এক

আসন পাতা। এক গ্লাশ জল দেওয়া রয়েছে পাশে। কমলাপতি দেখলেন পারুল মেঝেতে বসে খাচ্ছে। অল্প ধোঁয়া উঠছে ভাত থেকে ; ডান দিকে থুপ করা খানিক তরকারির মতন। শাকপাতার ঘণ্টটণ্ট হবে। জল-ঢালা ভাত খাওয়ার মত শব্দ হচ্ছে। গরম ডাল দিয়ে খাচ্ছে পারুল। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায়। উপোসী মানুষের মতন অল্প উবু হয়ে, ঝুঁকে পড়ে ফুৎফাৎ শব্দ তুলে কেমন করে যে খাচ্ছে—এই দৃশ্যটুকু অত্যন্ত অশোভন লাগল কমলাপতির কাছে।

কমলাকেও দেখতে পেলেন কমলাপতি। ডান দিকে বারান্দার থামে পিঠ হেলান দিয়ে কমলা চুপচাপ শূন্যে তাকিয়ে আছে। চৌকাট থেকে সরে গিয়ে বারান্দার কোণের দিকে নীহার। ভাঁজ করা, তোলা দু' হাঁটুর ওপর তার হাত আড়াআড়ি করে পাতা। নীহার সেই আড়াআড়ি হাতের মধ্যে, কোলের অন্ধকারে মুখ নামিয়েছে। অবিনাশের ঘরে আলো জ্বলছে দেখতে পেলেন কমলাপতি।

ছয়

ক-দিন থেকেই যাব যাব ভাবছিল কমলা, আজ ঘুরে এল বৌবাজার পাড়া।

এখন সন্ধ্যা; রাখহরি দাস লেনের মুখে অল্প চঞ্চলতা। লোকজন যেন বেশিই লাগছিল কমলার কাছে। এ-পথে লোকজন চলছে; যাচ্ছে আসছে, মোড়ের বিড়ির দোকানে রেডিও বাজছে; কিছু লোক সেখানে জমা। পান কিনছে কেউ, কেউ সিগ্রেট বিড়িটা—রাস্তার দিকে মুখ করে গান শুনছে কেউ।

দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সময়টা বেশ কাটল কমলার। এই সময়টুকু সে খোলা বাতাসের গন্ধ নিল শুঁকে শুঁকে, লোকজন দেখল অসংখ্য। কী অবাধ মুক্তি বাইরে! আকাশ এমন সুন্দরও হয়, এত লাল, সূর্যের আলোয় উজ্জ্বলতা এত—আর মানুষের মুখে মুখে কী অদ্ভুত প্রশান্তি—এই দৃশ্যগুলো যেন নতুন করে দেখল কমলা অনেক কাল পরে। কমলার মনে আজ অনেক খুশী, শান্ত শোভন এক মানসিক তৃপ্তি এবং আনন্দ। সেই তৃপ্তি দেহে মনে প্রাণে ধরতে পারছিল কমলা; অনুভব করতে পারছিল সুন্দর এক হৃদয়াবেগ।

কমলা গিয়েছিল পিসির বাসায়। দুর্গাপিতুরী লেনে। শুধু বেড়ানোই উদ্দেশ্য ছিল না কমলার। পিসিকে দেখবার ইচ্ছেটা ছিল বটে; তার চেয়েও বড় এক উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছিল। সনতের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। অথচ দরকারের কথা ভেবেও বাড়ির বাইরে পা-বাড়ানো সম্ভব হয়নি এতদিন। মা-কে রাজি করানো এক শক্ত ব্যাপার, তার

ওপর রাস্তাঘাটে বেরুতে গেলে গোনাগুনতি বাস ভাড়াটা নিয়ে বেরুনো যায় না। দু'টো চারটে পয়সা সঙ্গে থাকা দরকার। পারুল কতদিন থেকে বলছে তার একটা প্লাষ্টিকের ফুলকাটা বেল্ট চাই। ফ্রকের ওপর পরবে। আর চুলের রঙিন ফিতে। এ-সব আগে ছিল পারুলের ; এখন তা ছিঁড়ে-খুঁড়ে ব্যবহারের বাইরে। কমলা ভেবেছিল, যে-দিন সে বেরুবে, পারুলের জন্য কিনবে এ-সব। কিছু পয়সা জমানো ছিল কমলার। সামান্য। একদিন দুপুর বেলায় গুনতে বসল সেই অল্প সঞ্চয়। তাও অনেক ভয়ে। পাছে কেউ না দেখে ফেলে। বার তিন চারেক গুনে গেঁথে আট আনার মতন হল। যাতায়াতের ভাড়া দিয়ে পারুলের জিনিস কেনা হয় না এতে। কমলা আশা করেছিল দু'এক পয়সা করেও যদি হাতে আসে, তা হলে হয়ে যাবে। কিন্তু দু'এক পয়সা দূরে থাক একটা আধলা পর্যন্ত জমাতে পারল না। মনের ইচ্ছে চাপতে চাপতে শেষকালে রুমাবৌদির কাছ থেকে চার আনা ধার করেছে কমলা। না করে উপায় ছিল না। সংসারের যা অবস্থা—আর বসে থাকা যায় না। কিছু একটা করা দরকার—ভেবেছিল কমলা। কত মেয়েই তো আজকাল চাকরী করে খাচ্ছে। পথে ঘাটে কত মেয়েকে দেখেছে কমলা—যারা অফিসের সময় পুরুষদের সঙ্গে অফিসে যায়—ট্রামে-বাসে ভিড়ের মধ্যে উঠে পড়ে, আবার ফিরে আসে অফিসের পর। শ্যামবাজারে মন্দিরাকে দেখেছে কমলা ; মন্দিরাদিও চাকরী করত। দশটায় বেরুত ফিরত পাঁচটায়।

রোজ মন্দিরাদির কথা ভেবেছে কমলা।···মন্দিরাদি চাকরী করে, আমিও করতে পারি। আর কিছু না হোক এইট ক্লাশ থেকে নাইনে প্রমোশন পেয়েছিলাম আমি। ইংরেজিটা মোটামুটি লিখতে পারি ; বাংলা ভালই। কেন

আমি চাকরি পাব না···সেই ভরসাতেই কমলা চার আনা পয়সা ধার করবার সাহস সঞ্চয় করেছিল।···বাবা যদি চালাতে পারতেন, আর তু'তিন বৎসরেব মধ্যে স্কুল ফাইনালটা পাশ করে বেরুতে পারতাম আমি; পাশ করলে চাকরীর অভাব কি। সনতের কথাও মনে পড়ত, সনৎদা বলেছিল, এ-টা মেয়েদের যুগ। মেয়ে হয়ে যদি জন্মাতাম; কোন শালায় চাকরী আটকায়। সেই থেকে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল কমলার মনে, চাকরী সে একটা পাবেই।

বাস থেকে নেমে এই মোড়ের মাথায় থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কমলা। এই উজ্জ্বল আলো, এত লোকজন, কলরব—রেডিওর গান খানিক মোহিত করে রাখল তাকে সম্বিৎ-হারার মতন। সেই হারানো সম্বিৎ ফিরেও পেল সে আচমকা। জোরে ধাক্কা লাগল গা-য়ে। চমকে উঠল কমলা, দেখল, ধুতি পাঞ্জাবী পরা একজন ভদ্রলোকের মতন মানুষ তার পাশ ঘেঁষে হনহন করে চলে গেল। তার দিকে তাকাল কমলা চমকানো চোখে। অল্প বিরক্তি, মৃত্ব অস্বস্তির মতন লাগছিল তার।

বেশি দূবে নয়; একটুখানি এগিয়ে লোকটি দাঁড়াল। ফুটপাতে। তার হাতে সিগ্রেট। সিগ্রেট টানতে টানতে লোকটি ফিরে তাকাল কমলার দিকে। কেমন বিশ্রী কদর্য সে-চাউনী যে, কমলা তার বুকের ভেতরের অল্প কাঁপন ধরতে পারছিল।···ইতর বদমাশ কোথাকার! মনে মনে গাল দিল কমলা লোকটিকে উদ্দেশ্য করে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তার পা কাঁপছে। বুকের ভেতর ঢিবঢিব এক শব্দ। গলার কাছে কণ্ঠায় অত্যন্ত শুকনো শুকনো ভাব। কমলার মনে হল তার তেষ্টা পেয়েছে। ভয়ানক তেষ্টা। আর ভয় করছে সেই সঙ্গে। অত্যন্ত ভীত সতর্ক সন্দেহের চোখে

চঞ্চলভাবে তাকাল কমলা; ডাইনে বাঁ-য়ে সামনে এবং পেছনে।

এখনও রেডিও বাজছে জোরে। কী একটা গান হচ্ছে; তার সুর অত্যন্ত চপল হালকা খেলো। পানের দোকানের সামনে আগের মতনই তেমনি ভিড়। লোকজনও চলছে। বিশ্রী কুৎসিৎ এক গন্ধ নাকে আসছিল। রুমালে নাক চাপা দিয়ে কমলা দেখল তার আশে পাশেও দু' একজন দাঁড়িয়ে। সামান্য ঘন হয়ে আসার মতন তাদের ভাব।

যেন পথ হারিয়ে ফেলে অজানা অচেনা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে কমলা; এখন পথ খুঁজে বার করতে হবে তাকে। অত্যন্ত চঞ্চল চোখে, অস্থিরতাকে কোনোরকমে চেপে কমলা তাদের গলি দেখল।...এই ত রাখহরি দাস লেন। হারানো পথ খুঁজে পেয়ে এই ব্যাকুলতার মধ্যেও আশ্বস্ত হল কমলা। এই পথ যেন তার মনে সাহস দিল, বল দিল, অদ্ভুত এক শক্তি জাগাল মনে।

হাঁটতে শুরু করল কমলা। তার মনে তখনও ভয়, অস্বস্তি আর ব্যাকুলতার ভাব। আর ঘৃণা। কমলা মনে মনে সেই ইতর লোকটির প্রতি তার মনের যত জ্বালা ক্ষোভ তিক্ততা ঢেলে দিচ্ছিল; অত্যন্ত অপ্রসন্নতা আর বিরক্তিও।... লোকটি কি আমাকে সেই রকম কিছু মনে করছিল? রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ানো খারাপ মেয়েছেলের মতন?... ভাবতে গিয়ে কমলা নিজেকে নিজেই ধমকাল। মোটামুটি এক সান্ত্বনার ভাবও তৈরি করল।...না, হয়ত ঐ মানুষটির কোনো বদ বা কুমতলব ছিল না। হঠাৎ ধাক্কা লেগে গেছে। অমন ধাক্কা তো কত লোকের সঙ্গেই লাগে। কিন্তু তার মনগড়া সান্ত্বনার চাইতেও আসল সত্যটা অনেক বেশি বাস্তব বুঝতে পারল কমলা। এই কথাটাকে নানারকমভাবে ভাবল;

ভাঙল, চুড়ল—কত রকম উদ্দেশ্য বার করল কিন্তু মনের অস্থিরতা কি চঞ্চলভাব কোনোটাই কমল না; কমছে না—কমলা অত্যন্ত দ্রুততালে পা চালাল।

আলো আছে এই পথে, অন্ধকারও সামান্য সামান্য। একটা দু'টো গাছের ছায়া পড়েছে পথে। উঁচু বাড়ি ঘেঁষে মোড় নিতে গিয়ে মলিন হয়েছে আলো। গ্যাসেব থাম দূরে। কমলা যত থামের কাছাকাছি আসছিল, সাহস বাড়ছিল তত। সেই আলোও পেছনে রেখে যখন অল্প আলো আর হালকা অন্ধকারে মিশেমিশি ছায়ার মতন জায়গায় আসছিল, তার ভয়ের মাত্রা বাড়ছিল আবার। কখনও কখনও পাশ দেখছিল কমলা, মাথার ওপরের গ্যাসেব টিমটিমে আলো। এবং আকাশেও চোখ পড়ল তার কয়েকবার। কমলার মনে হল শিশির পড়ছে। কুয়াশার ভাব বাতাসে। অত্যন্ত হালকা মিহি তার রূপ। আলোব নিচে সেই মিহি কুয়াশার ঝাপসা রূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

দ্রুত পা-য়ে আসছিল কমলা; বনমালী গড়াই লেন যেখানে মিশেছে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে। কে! কমলা নিজেব মনে জিজ্ঞেস করল। নিতাই না?

হ্যাঁ, নিতাই। এতক্ষণে কমলা মনে মনে আশ্বস্ত হল। সামান্য সাহসের ভাবও যেন ফিবে পেল।

'আপনি কি এই দিকেই ফিরছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও···' আরও কিছু বলতে গিয়েছিল কমলা; কি ভেবে চুপ করল।

প্রথমটা নিতাই ভাবতে পারেনি কমলা তাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতে চাইছে। পরে বুঝতে পারল সে-কথা। পেরে কেন যেন কমলাকে দেখল। পা থেকে মাথা অবধি। এক

পলকের এই দেখা, তবু যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিতাই পরখ করল।···'কলকাতায় গিয়েছিলেন?' নিতাই অন্তরঙ্গ হওয়ার মতন গলায় শুধলো।

'হ্যাঁ, বৌবাজারে; পিসিমার বাড়ি।' হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিল কমলা। তার গলায় মৃদু কুণ্ঠার ভাব।

নিতাই কি বলবে ভেবে পেল না। যেন হঠাৎ যা আশা করতে পারেনি তাই পেয়ে ভয়ানক আনন্দে সব হারিয়ে ফেলেছে। কিংবা সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলবে ঠিক করে রাখা সত্ত্বেও আর খুঁজে পাচ্ছে না কিছু।

কিছুটা পথ আর কথা নেই। নিঃশব্দে নির্বাক হয়ে খানিকদূর এগুল ওরা। কমলা মোটামুটি ভরসা পাওয়া সত্ত্বেও খুব নির্ভয় হতে পারছিল না। অন্তত চুপচাপ থাকতে আরও যেন ভয় পাচ্ছিল; অসহ্য লাগছিল এই নীরবতা। '···আপনি এ-দিকে কোথায় গিয়েছিলেন?'

'আমি?' নিতাই কমলার চোখে চোখ রাখল। 'আমার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। কাছেই। এই তো বনমালী গড়াই লেনে। সেখান থেকে ফিরছি···'

'ও', কমলা চোখ নামাল। তাকাল রাস্তার দিকে—'সন্ধ্যার দিকে এই রাস্তাটা কী ভয়ানক, আমার ভয় করছিল।'

'তাই বুঝি?' নিতাই অল্প হাসির ভঙ্গি করল। 'অনেক পুরনো রাস্তা, গ্যাসের বাতিরও জোর নেই···' কথা বলার ফাঁকে অন্য এক ভাবনা ভাবছিল নিতাই। এবার বুক পকেট থেকে একটা সিগ্রেট বের করল। আঙুল দিয়ে টিপল খানিক। ঈষৎ তুমরানো ভাব ছিল সিগ্রেটে, চাপ লেগে ভাঁজ পড়েছিল, বেঁকে গিয়েছিল সামান্য—এখন তা সোজা করে ঠোঁটে চাপল। শব্দ করে কাঠি জ্বালল দেশলাইয়ের।

কমলা ফিরে তাকাল: দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে নিতাইয়ের সিগ্রেট ধরাবার ভঙ্গি দেখল। · ফস করে আগুন জ্বলে উঠল কাঠির মাথায়। লালাভ আগুন, তার মধ্যে সামান্য হলদেটে ভাব মেশানো; কাঠির নিচের দিকে নীলচে একটু আভা। মিহি ধরণের। ধরাবার সময় আলোর রূপ লম্বা আকার ধরেছিল; তারপর সামান্য গোল হতে হতে দু'পাশে অল্প টাল খেলো। দুই হাতের তালুকে গোলমতন করে আলো আড়াল করল নিতাই; মুখের কাছে তুলল। কমলা দেখল আলোর আভা পড়েছে নিতাইয়ের মুখে। চকচক করছে কপাল, নাকের ডগায় সামান্য উজ্জ্বল আভা। কুঁচকে আনা ঠোঁটে, লম্বা-ছাঁদের চিবুকের ভাঁজে আলোর শুভ্রতা আচমকা জাগল। কমলা নিতাইয়ের গোটা মুখ, তার ভাঁজ, খাদ কুঞ্চন পর্যন্ত দেখল। চোখে অল্প স্বপ্নালুভাব, ঈষৎ নম্রতা এই মুখে। ভালই লাগল কমলার।

একজন দু'জন করে লোক যাতায়াত করছে এই পথে। পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে তারা দেখছিল ওদের। সম্ভবত অন্য চোখে। হাঁটতে হাঁটতে কখন অল্প সরে এসেছিল কমলা, প্রায় গা-য়ে গা-লাগার মতন। লজ্জা পেয়ে কমলা সরে গেল খানিক।

নিতাইকে প্রথম দেখেছিল কমলা সেই যে-দিন উঠে এল এ-পাড়ায়; সে-দিন। বাসা চিনতেন না কমলাপতি, নিতাই সঙ্গে এসে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে মুখ-চেনা কিন্তু নাম জানত না। সন্ধ্যা ওকে বলেছিল নিতাইয়ের নাম। মাঝে মধ্যে এ-পথে যেতে খোঁজ খবর নিত নিতাই, গল্পটল্প করত কমলাপতির সঙ্গে। সেই থেকে বুঝেছে কমলা, ভেতরে যাই থাক না কেন এই ছেলেটি মোটামুটি ভদ্র।

নিতাইয়ের বয়সটা মোটামুটি আঁচ করতে চেষ্টা করল কমলা।···কত আর হবে, বড় জোর আমার সমান কিংবা এক আধ বছরের ছোটও হতে পারে।

সিগ্রেট ধরিয়ে কি যেন বলল নিতাই, কমলা খেয়াল করেনি। তবু কমলা আর তাকাল না।

চাকায় কিম্ভুত শব্দ তুলে মোষের গাড়ি আসছিল এই পথে। প্রথমটা চোখে পড়েনি। আবছা অস্পষ্ট মতন মনে হচ্ছিল। তারপর এক সময় মুখোমুখি হল গাড়িটা। ছোট এই পথে গাড়িটাড়ি ঢুকলে পাশ কাটিয়ে যেতে পর্যন্ত অসুবিধা। কমলা বাঁ-দিকে সরে এল। নিতাই পড়ল দোটানার মধ্যে। ডাইনে যাবে না বাঁ-য়ে ভাবতে ভাবতেই সামনে এসে গেল গাড়ি। নিতাই শেষ পর্যন্ত ডাইনেই সরে গেল।

গাড়িটা চলে গেল, আবার ওরা এল রাস্তার মাঝ-বরাবর। একটা বাঁক ঘুরে এসে এই জায়গাটা অত্যন্ত নীরব, স্তব্ধ। ডানদিকে বাড়ি ঘর নেই। গাছ গাছালির নিবিড়তা, ভাঙা ইটের স্তূপ, ছোট আগাছার অল্প জঙ্গল—-চাপা অন্ধকারের সামান্য গাঢ়তার ঢেউ। এই পথ আবার বেঁকেছে সামনে। সামান্য আলোও নেই ; ঘন ছায়ার মতন আঁধিয়া। এতক্ষণে কমলার মনে হল, সে ক্লান্ত। এই অসহ ক্লান্তিতে তার পা কেমন জড়িয়ে যেতে চাইছে। চোখের পাতায় আবেগের মতন এক ভারী নিবিড়তা। কমলার মনে হল, পথ আরও বেঁকেছে।···কতকাল কত যুগ ধরে এই পথে হাঁটছি আমরা··· পিসিমা কাঁদছে···কমলার মনে অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা জাগল। সামান্য আচ্ছন্ন ভাব। রুক্ষ কর্কশ সুরে রাতজাগা কাক ডাকল একটা। কোথায়, কোন গাছের মাথায় ডালপালার আড়াল থেকে ডাকছে! চমকানো এক ভাব কমলার মধ্যে। সে দেখল, নিতাই দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'আপনাকে কি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেব?' নিতাই শুধলো।

রাস্তা দেখল কমলা। আর অন্ধকার। যেন তার মনের মধ্যে জমা ভয়ের অস্তিত্ব এখনও আছে কিনা বুঝবার চেষ্টা করল।

'ডান দিকে আমাদের বাড়ি।' নিতাই যেন শেষবারের মত কমলার মুখ দেখল। 'আপনার…'

'আচ্ছা', কমলা মুখ নিচু করে জবাব দিল।

'আচ্ছা', নিতাই মুখ তুলে তাকিয়ে নিল।

দু'জন দু'পথ ধরল। খানিক এগিয়ে পেছনে তাকাল কমলা। নিতাই নেই।

প্রায় ফাঁকা এই উঠোন। সন্ধ্যে হয়েছে অনেকক্ষণ। এ-বাড়ির রান্নাবান্নার পাট চুকে গেছে—খাওয়া-খাওয়ির পালাও শেষ। কেবল কমলাদের ঘরের পাট শেষ হয়নি এখনো। সুষমা কমলাপতির সঙ্গেই খাইয়ে দিয়েছে পারুলকে। সে বাসন-কোসন ধুয়ে খানিক বসে ছিল। লতাদের ঘর ঘুরে এল এক ফাঁকে। লতার মা তাদের দেশের গল্প করতে করতে আপশোস করছিল। খানিক তা শুনেছিল সুষমা। এক সময় এই একঘেয়ে নিত্যকারের গল্পও বিরক্তিকর লাগল। সুষমা উঠে এসে বারান্দায় বসেছিল খানিক ; এখন শুলো পারুলকে নিয়ে। শুয়েও কান সজাগ করে থাকল, কমলার পা-য়ের শব্দ কি তার কথা শোনবার জন্য। এতক্ষণ এই জন্যই শুতে পারছিল না সুষমা। দুশ্চিন্তায়। সুষমা ভেবেছিল কমলা ফিরবে সন্ধ্যে সন্ধ্যেয়—কিন্তু সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামল, কমলা এল না ; সুষমার মনের অস্থিরতা বাড়ছিল।

সুষমা চলে আসার পর লতার মা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। কমলাপতির ঘরের একটা দরজা ভেজানো অন্যটা অল্প খোলা। ঘর অন্ধকার। নন্দ আর রুমা বেরিয়েছিল বিকেলে; খানিক আগে ফিরে এসে হাতমুখ ধুয়েই দরজায় খিল দিয়েছে। ঘরে আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না—বোঝা যায় না। সন্ধ্যাদের ঘরে এখনও আলো রয়েছে। অবিনাশ ফেরেনি। ননীবালা ত্থ' গেরাস ভাত মুখে তুলেছিল, তাও খেতে না পেরে উঠে পড়েছে। সে এখন বিছানায়। তার গলার কাছে সর্দি-বসা এক ঘ্যাড়ঘেড়ে শব্দ হচ্ছে। ছাই-মাথা-মুণ্ডু কিছুই মুখে রোচে না। বিশ্রী বিস্বাদ ভাব। চোখমুখ খিঁচড়ে শুয়ে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছে ননীবালা। দরজার ফাঁকে বাতাসের ঝাপটা আড়াল করে কুপি রেখেছে; তার অল্প আলোয় কেমন অস্পষ্ট দেখাচ্ছে ঘরখানা।

শুধু উঠোনটা কেন, গোটা বাড়িটাই এখন নিঝুম। কোনো শব্দ এ-বাড়ির নিস্তব্ধতাকে ভাঙছে না। কেবল মৃত্থ হাওয়া বইছে। কুয়োপাড়ের কাঁঠালগাছের পাতায় পাতায় এক অদ্ভুত শব্দ বাজছে। মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁ ডাকার মতন শব্দ উঠছে। টানা। খানিক এই শব্দ হল, আবার চুপচাপ। মাঝরাত কি শেষরাতের মতন স্তব্ধতা এখানে।

সন্ধ্যা আর নীহার এখনও জেগে। বাইরে। সন্ধ্যাদের ঘরের বারান্দার কোণাকুণি অন্ধকারের মধ্যে ত্থই মূর্তি। খুব ঘন ঘনিষ্ঠ অবস্থা ত্থ'জনের। মুখোমুখি। সন্ধ্যা দেওয়ালে পিঠ ঠেসান দিয়ে ত্থ'পা ছড়িয়ে বসেছে। নীহরের এক পা পাতা অবস্থায় হাঁটুর কাছে ভাঁজ হয়ে ঠেকেছে সন্ধ্যার উরু বরাবর। অন্য পা হাঁটু মুড়ে তোলা। খুব নীচু গলায়, অস্পষ্ট স্বরে কথা বলছে ওরা। ফিসফিসিয়ে। সন্ধ্যা বলছে।

নীহার শুনছে। অত্যন্ত কৌতূহল উৎসাহ মনোযোগের সঙ্গে সন্ধ্যার কথা শুনছিল নীহার। থেকে থেকে শুধোচ্ছিলও কিছু।

মশার ডাকের পিনপিন এক শব্দ অত্যন্ত ক্ষীণ সূক্ষ্ম-ভাবে বাজছিল। পা-য়ের পাতা, হাঁটুর নীচ অংশ সামান্য জ্বালা করছিল; সন্ধ্যা তা ঢেকেঢুকে জুত করে বসল। এতক্ষণ এমনই মশগুল ছিল যে, খেয়াল করেনি। এইবার মশার কামড়ের জায়গাগুলো জ্বালা করছে। নীহারও সতর্ক হল সন্ধ্যার দেখাদেখি।

খানিক আগে চাপা হাসির এক মৃদু তরঙ্গ উঠেছিল। নীহার একটা মশাকে মারল আচমকা থাপড় কসে। বারবার বিরক্ত করছিল মশাটা। পিনপিন করছিল কানের কাছে, গাল ঘেঁষে। কখনও চিবুকের তলায়, কণ্ঠার কাছে, ভূরুর তলায়, চোখের পাতায় সুড়সুড়ি দিচ্ছিল উড়ে উড়ে; কপালেও বসছিল। নীহার শাড়ির আঁচল দিয়ে হাতপাখায় হাওয়া করার মতন করে মশা তাড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত লতার কথা উঠতে হাত থামল নীহারের।

'লতার ব্যাপারটাও ধরেছি আমি···' সন্ধ্যা তার মুখটা সামান্য সরিয়ে আনল।

'কি?' নীহারের আঁচল-ধরা হাত কোলের কাছে থামল।

'এমনিতে দেখছিস অমনি, কিন্তু তলে তলে—বাব্বা···'

'লতাও তা হলে', অস্ফুট গলায় প্রায় বিস্ময়ের সঙ্গে কথাটা বলল নীহার। মনে হল তার গলার দুই পাশের দু'টো শিরা ফুলে উঠল।

হাসির কারণ ঘটল তখন। মোটামুটি অনুমান করে আচমকা নিজের গালে এক থাপড় মারল নীহার। মশা মারল।'···কী বেয়াড়া মশারে বাবা!'

'কেন, কী করল আবার?'

'গালে বসেছিল। রক্ত খেয়েছে কত; আঙুল ভিজে গেছে আমার।' নীহার অন্ধকারের মধ্যেই হাতটা চোখের সামনে টেনে আনল। কিন্তু অন্ধকারে রক্তের রঙ সে দেখতে পেল না।

অদ্ভুত চাপা গলায় সরু সুরে অল্প হাসল সন্ধ্যা—'খুব রসিক রে ও।'

'কে?'

'মশাটা। বস তো বস একেবারে গালের ওপর?' সন্ধ্যা অনুমান করে নীহারের গাল ছুঁল, 'তোর গালটা খুব সুন্দর, কেমন টোপা কুলের মতন। আমি পুরুষ হলে···'

'আহা!'

'সত্যি।'

'হেস্।'

'নিখিলকে বলিস, বুঝলি?'

অনেক খাত বয়ে শেষ পর্যন্ত আলোচনাটা অন্যদিকে বইল। বাড়ির কথা, সংসারের অভাব-অনটনের, কুমারী মেয়েদের হাতে দু' চারটে পয়সা না আসার···সেই জন্যই একজন দরকার। শখ আহ্লাদ বলে কথা আছে একটা। সিনেমা-টিনেমা, দু' একখানা ভাল ব্লাউজ ট্লাউজ··· শেষ পর্যন্ত এল রুমাবৌদির প্রসঙ্গ। সেখানেও থেমে থাকল না আলোচনা। লতার কথা, মশার রগড়ের কথা ঘুরে ওদের চাপা সুরের আলাপ শেষ পর্যন্ত আবার ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে এল।

সন্ধ্যার মুখ দেখতে পাচ্ছিল না নীহার। নীহারের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না সন্ধ্যা। কিন্তু দু'জন পরস্পরের হৃদস্পন্দনের শব্দটুকু শুনতে পাচ্ছিল। চোখে না দেখলেও

মনে মনে উভয়ে উভয়ের মুখের ছবি তার ডৌল ভাঁজ মসৃণতা, একটা তু'টো ব্রণ-ট্রনর দাগ, ভুরুর বক্রতা, অধরের লালিত্য, চোখের পাতার মৃত্ব অস্থিরতা, ঘামের বিন্দু জমা নাকের ডগা, কপালের দাগ—সমস্ত কিছু মিলিয়ে এক ছবি কল্পনা করে নিয়ে অন্ধকারে বিষন্নতা আড়াল করে কথা বলছিল। একটা তু'টো দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দও শুনতে পারছিল। বুকের শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল এই স্তব্ধ অন্ধকার সময়েরও ছন্দ আছে; সেই ছন্দ বুকের তলার শব্দ।

সন্ধ্যা নীহারের উরুর ওপর আস্তে চিমটি কাটল।

নীহার চমকাল সামান্য। মুখ সরিয়ে আনল সন্ধ্যাব দিকে। 'কী?'

'তোর দিদি এল।' খুব চেপে বলল সন্ধ্যা।

'দিদি! কই?'

'ওই যে আসছে—'

এই স্তব্ধ নিঃসাড় উঠোন। গাঢ় নয়, জলো নয় মাঝমাঝি রঙের এক অন্ধকার। নীহারেব মনে হল, ছায়ার বেশে এক মূর্তি আসছে। তু'হাতে অন্ধকার ঠেলে, অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন রুগ্ন পরাজিত এক মূর্তি টলে টলে; অন্ধকার সরিয়ে সে পথ করতে চাইছে—অন্ধকার দ্বিগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সে পারছে না···পারছেনা···পারছে না···

ঘরে বাতি জ্বলছিল নিবু নিবু, তার ম্লান মিহি আলো লেপটে রয়েছে মশারীর এক অংশে, মেঝেতে ছড়িয়েছে সামান্য। দেওয়ালের নিচের দিকে অনুজ্জ্বল আভা। সুষমা কমলার গলা শুনে মশারীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আলো জোর করে দিল।'···এত দেরি হল তোর?'

'কি করব, পিসিমা ছাড়তেই চায় না।'

'আমিও ভাবছিলাম সে-কথা। তাই বলে এত দেরি…'

কমলা ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গ এড়াতে চাইল। '…পারু কি ঘুমিয়ে পড়েছে, মা ?'

'হ্যাঁ।'

না, ঘুমোয়নি পারুল। তন্দ্রার মতন খানিক ঝিমধরা ভাব এসেছিল, কমলার গলা শুনতে পেয়ে পারুল উঠে এসেছে এতক্ষণে।

'ও-মা, এখনও ঘুমোসনি লক্ষ্মীছাড়ি!' সুষমার মুখে অল্প প্রসন্নতা। 'কাণ্ড দেখে মেয়ের। আমি ভাবলাম বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে।'

কমলা পারুলকে কাছে টেনে নিয়ে সুষমার চোখে তাকাল। 'আমি যে যাওয়ার সময় ওকে বলে গিয়েছিলাম ওর ফিতে আর ‥'

'ও-সব আবার কেন আনতে গেলি ?'

'আনলাম।' কমলা তার কোল-ঘেঁষে বসা পারুলের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মুখের দিকে তাকাল, 'তোর চোখে যে ঘুম রয়েছে রে পারু, উঠে এলি যে বড়।'

পারুল তার ঘুম-জড়ানো চোখে তাকাল দিদির দিকে। তার চোখের পাতা দু'টো অল্প ফাঁক।

'এনেছি এনেছি…' কমলা একগজ লাল ফিতে আর প্লাস্টিকের ফুলকাটা বেল্টটা পারুলের কোলের কাছে ধরল, 'দেখতো কেমন।'

ঘুমে ঢোলা চোখে অল্প হাসির আভাষ ফুটল পারুলের। খুশীর সামান্য উজ্জ্বলতা। জোর করে ভূরু টেনে পারুল দিদির দিকে তাকাল কৃতার্থ এবং আত্মতৃপ্তির ভঙ্গিতে।

সুষমা দু'মেয়ের মুখের তৃপ্তির ভাব এবং হাসিটুকু লক্ষ্য

করল খানিক। তার মনেও প্রসন্নতা, সামান্য কোমলতা এবং তৃপ্তির ছোঁয়া। 'তোর পিসেমশাই ছিল বাড়িতে?'

'না। পিসিমা একলা···সুনুদা পর্যন্ত পাড়া-টহল দিতে বেরিয়েছে। পিসিমার শরীর টরীর বড় খারাপ হয়ে গেছে, মা।'

'কেন?'

'কেন আবার; অসুখে। এই নিয়েই সংসার টানতে হচ্ছে।' কমলা যেন দুঃখের গলায় সুষমার কাছে অভিযোগ করছে। 'ঠিকে ঝি ছিল না আগে? তাও উঠিয়ে দিয়েছে। আমি গিয়ে দেখলাম ভেজা-কাপড়ে রাজ্যের কয়লা নিয়ে বসেছে। ভাঙতে।'

'জেদের জন্যে', সুষমা তার চাপা নিশ্বাস ছাড়ল এতক্ষণে, 'যা জেদ ধরবে তা করবেই করবে; এই একগুঁয়েমীর জন্যেই মরল মেয়েটা।'

'একগুঁয়েমীটা আবার কোথায় দেখলে তুমি?' সুষমার কথাটা যেন মনঃপুত হল না কমলার কাছে; 'আমি তো দেখলাম। না আছে পিসেমশাইয়ের টান, না সুনুদার। অথচ পিসিমা এই অসুখ শরীরে ওদের জন্য খেটে খেটে মরছে।' কমলার কথায় অল্প অপ্রসন্নতার ভাব এবং সামান্য বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল। 'আমি তোমাকে বলে রাখছি মা, যা স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে না, পিসিমা আর বাঁচবে না বেশি দিন।'

খানিক আগে নীহার এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল; এখন হাঁটুমুড়ে বসল মেঝেয়। কমলা আর সুষমাব কথা শুনছিল নীহার মনোযোগ দিয়ে। এক সময় তার চোখটা পারুলের কোলে পড়ল। কথা না বলে, অল্প হেসে হাত বাড়িয়ে দিল নীহার। দেখতে চাইল পারুলের ফিতে আর রঙিন বেল্টটা। পারুল নীহারের দিকে তাকিয়ে তার জিনিস আরও টেনে

নিল কোলের কাছে। ভাবটা এই, সে দেবে না। নীহার চোখের ইশারায় অল্প ধমক দিল।

'না-না, ওই অত বেলা অথচ তখনও খায়নি পিসিমা।' সুষমা কি শুধিয়েছিল, তার জবাবে কমলা বলল, 'শেষ পর্যন্ত আমাকেও খাইয়ে ছাড়ল।'

'আমার কথা কিছু বললি দিদি?' নীহার সরে এল আরও একটু, 'পিসিমা জিজ্ঞেস করেনি কিছু?'

'করছিল।' কমলা নীহারের কথায় সায় দিয়ে পুরনো কথাতেই চলে এল। 'খাওয়া-দাওয়াও খারাপ হয়ে গেছে পিসিমাদের।'

•

কমলাপতি বিছানায় শুয়েছিলেন চুপচাপ। ঘুম আসছিল না তাঁর। কমলা ফিরল, কমলাপতি তা জানেন। পরে সুষমার সঙ্গে তার কথাবার্তার কিছুও কানে এসেছিল। এখন আর ততটা শোনা যাচ্ছে না। সুষমা কমলা আর নীহারের কথাগুলো ছোট হয়ে এসেছে। হয়তো বা গোপণীয় কিছু বলছে—যা জোরে বলা অশোভন। মাস দুই আগে একবার কমলাপতি গিয়েছিলেন; মনমোহন দুঃখ করল অনেক। সিজনে এবার মাল ওঠাতে পারেনি; বিক্রী-পাটার অবস্থা তাই খারাপ।

এখন বোঝেন কমলাপতি হিসাব করে না চললে মানুষের অবস্থা এমনি হয়। নিজেও বুঝেছেন। মনমোহন যথেষ্টই কামাত। কাঁচা মালের কারবার, পয়সাও কাঁচা—সেই পয়সা মনমোহন রাখতে পারেনি। ফষ্টিনষ্টি এমন কিছু নয়, শুধু খেয়ে খেয়েই মনমোহন পয়সাগুলো জলের মত খরচ করে ফেলল। এখন বুঝতে পারছে, অনুতাপ করছে।

আসলে এই হিসাব-টিসাব করে চলাটা সকলে চলতে

পারে না। সে-রকম মানুষই হয় আলাদা ধাঁচের। তারা আজকের সকালে বসে তিনদিন পরের কথা ভাবে। হয়তো গোটা মাসটা কিংবা বৎসরের। এই ছকে-বাঁধা জীবন, দু'টো চারটে পয়সার জন্য ভাবনা-চিন্তা এ-জীবন কমলাপতি চান নি। মনমোহনকেও দোষ দেবেন না তার জন্য।

শুয়ে শুয়ে কমলাপতি বুঝতে পারলেন ওরা উঠল। সুষমা আর নীহার বসে ছিল কমলার জন্যে। এবার খেতে যাচ্ছে ওরা।

কমলাপতির মন কেমন করছিল। নির্মলারা কেমন আছে, একটু জুতটুত করতে পারল কিনা মনমোহন—ইচ্ছা হচ্ছিল উঠে গিয়ে শুধোন কমলাকে ; খোঁজ খবর নেন। এর জন্য অদ্ভুত এক প্রাণের টান অনুভব করছিলেন কমলাপতি। কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও উঠলেন না। কি ভেবে ডানদিকে কাৎ হয়ে শুয়ে বালিশ আঁকড়ে ধরলেন।

ওরা কথা বলছে, তার অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পারছিলেন কমলাপতি। এই অন্ধকার আর ভাল লাগছে না, লাগছে না—কমলাপতি উঠতে চাইলেন। উঠলেন। বেরিয়ে আসতে চাইলেন। দাঁড়ালেন বারান্দায় এসে। তারপর রান্নাঘরের পাশ দিয়ে কুয়োপাড়ের দিকে গেলেন। বাথরুমে। সেখান থেকেও ফিরে এসে কি মনে করে রান্নাঘরের পাশে দেওয়াল-ঘেঁষে দাঁড়ালেন।

'ও-দু'খানা খেয়ে উঠলে পারতিস।' সুষমা কমলাকে বললেন।

'একদম ক্ষিদে নেই আমার ; অ-বেলায় খেয়েছি পিসিমার সঙ্গে···।' কমলা বাকি দু'খানা রুটির দিকে তাকাল···'কিছুতেই ছাড়ল না পিসিমা।'

'আমি একদিন যাব।' নীহার শেষ রুটির টুকরোটা মুখে তুলে সুষমার দিকে তাকাল।

'ওর দু'খানা তুই খেয়ে নে নীহার।'

'না।'

'তা হলে থাক, কাল সকালে পারু খাবে।'

খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হল কমলাদের। নীহার হাত মুখ ধুয়ে উঠে গেল; সুষমা বাসন-কোসন সাজিয়ে মেঝের এঁটো তুলছিল, কমলা বাসনগুলো তুলতে যেতে সুষমা আপত্তি করল, 'আমি মেজে দিচ্ছি, তুই যা কুমু।'

'তোমার হতে হতে ধোয়া হয়ে যাবে আমার।' কমলা বাসনগুলো তুলে নিল।

'এতদূর থেকে এলি,' ন্যাতার ওপর জল ঢেলে অল্প ভিজিয়ে নিয়ে সুষমা চোখ তুলল। 'রাতও হয়েছে অনেক। তুই বরং যা, শোগে।'

'কতক্ষণ আর লাগবে, জল তো তোলাই রয়েছে।' কমলা ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, 'মুছে-টুছে তুমি ঘরে যাও।'

সুষমা কমলার দিকে তাকিয়ে কি ভাবল। সামান্য সময় তার হাত থেমে রইল; অনেকটা অবাকের মতন ভঙ্গি মুখ-চোখের। বুকের তলা থেকে ছোট অস্পষ্ট মতন ক্ষীণ দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়তে গিয়েও চাপল। মাঝে মাঝে এমনি অবাক কি চমকানো ভাব হয় সুষমার। দুই মেয়ের চলাফেরা কি মুখের দিকে তাকায়; ওদের বাড়ন্ত শরীর, মুখের রেখা একটা কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সুষমা তখন বোঝে তার মেয়েরা বড় হয়েছে; অনেক বড়। বিয়ের বয়স পর্যন্ত পার হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। এই মেয়েদের নিয়ে কী করবে সে?

প্রজাপতির নির্বন্ধ বলে একটা কথা আছে ; হাজার কথা হবে, মেয়েদের বিয়ে হবে তারপর। কিন্তু এই সংসার থেকে হয়তো কোনোদিনই বিয়ের ব্যবস্থা হবে না মেয়েদের। মাঝে মাঝে এ-সব কথা ভাবে সুষমা। মেয়েদের প্রতি বাবা-মার যে কর্তব্য তার কিছুই পালন করতে পারছে না তারা। সেই অক্ষমতার বেদনা সুষমাকে পীড়ন করে। স্বামীর ব্যর্থতা, সংসারের ভয়ানক পরিস্থিতি—হয়তো দু' দিন পরে দু' টুকরো রুটি পর্যন্ত জুটবে না—এ-কথা ভেবে সুষমার মনের তলায় এক অক্ষম আক্রোশ, ক্ষোভ, গ্লানির জ্বালা আরও তীব্রভাবে তাকে আঘাত করে।

যতটা এর জন্য ক্ষোভ তার চাইতেও বেশি নিজের ওপর। অক্ষমতা ব্যর্থতার এই চূড়ান্ত অবস্থাটা সুষমাকে মাঝে মাঝে ভয়ানকভাবে পেয়ে বসে।···আমরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সংসারের কাছে, সন্তানদের কাছে, এমন কি জীবনের কাছেও হেরে গেছি···হেরে গেছি···হেরে গেছি—দাঁতে দাঁত বসেছিল শক্তভাবে, সামান্য ফাঁক হয়েছিল ঠোঁট—চোখের টানা ভূরু কুঁচকে জড়িয়ে চোখ ছোট হয়ে এসেছিল, দুই ভূরুর সন্ধিতে তিনটে চারটে খাড়া ভাঁজ—সুষমার হাতের মাংস শক্ত হল। কাঠ পাথর কি লোহার মতন কঠিন। আঙুলগুলো গাঁটে গাঁটে ভেঙে শক্ত হয়ে মানুষের টুঁটি টিপে ধরার মতন আক্রোশে ন্যাতাটাকে টিপে ধরল প্রাণপণে। পা-য়ের গোড়ালীর কাছে টান পড়ল শিরায়, হাঁটুর সন্ধিতে টাটানো মতন অল্প ব্যথা, কোমর টনটন করছে ; শিরদাঁড়ায় ঢাক পেটানোর শব্দটা বুকে এসে জমছে···

'মা।' কমলার আচমকা, মৌমাছির গুঞ্জনের মত ডাক কানে এল সুষমার। তার শরীরের কঠিন শক্ত বন্ধনের ভাবটা হঠাৎ যেন কেমন আলগা হয়ে গেল। খুলে খুলে

গেল। অসাড় মনে হল শরীর। অত্যন্ত শিথিল ক্লান্ত অবসন্ন। সুষমা ঘোর-চোখে মেয়ের দিকে তাকাল। তার চোখের দৃষ্টিতে ঝাপসা কুয়াশার ভাব; অত্যন্ত অস্পষ্টতা। দরজা নড়ছে; ডাইনে হেলল, বাঁ-য়ে বেঁকল, ঝুঁকে পড়তে চাইল সামনে, পেছনে। শান্ত নীরব অচঞ্চল জলে হঠাৎ ঢিল ছুঁড়ে ঢেউ তোলার মতন ঘরের ছাদে ঢেউ উঠল। একেবেঁকে, নামা-ওঠা করে আবার স্থির হল। গলার কাছে উত্তরঙ্গ কান্নার তাণ্ডব। সুষমার মনে হল তার স্বামীকে সে হত্যা করেছে। গলা টিপে মেরেছে। আক্রোশে, উন্মাদের মতন রক্ত মাংস ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়েছে। এখন সেই শরীর তার হাতের মুঠোয় নরম ঠাণ্ডা শীতল। দলা-মোচড়া পাকানো ন্যাতার মতন। সুষমা মনে মনে ডুকরে কাঁদল। 'কুমু···কুমু'—সুষমা প্রাণপণে ডাকল তার গলা চিরে রক্তাক্ত করে। কুমু কুমু কুমু···সুষমার চোখ কী ভয়ানক নিষ্কলঙ্ক নির্বাধ শূন্যতায় ঘুরছে ক্লান্ত জোড়া পাখির মতন। বিশাল বিরাট আদিগন্ত ধূ ধূ পৃথিবীর কোথাও কিছু নেই, সুষমার চোখ-পাখি ছু'টোর পাখা ক্লান্ত অবসন্ন। তার বুকের কাছে শেষ-নিঃশ্বাসের দলাটা আটকে গিয়ে নড়ছে নড়ছে নড়ছে···

'ওমা, তুমি এখনও মোছনি মেঝে!' কমলা বাসনের পাঁজা ঘরে রেখে এসে চৌকাটে দাঁড়াল, 'মা মা···'

···সুষমার পাখা বুঁজে এল, আর মেলছে না, খুলছে না; শক্ত কোনো ফলের মতন বোঁটা ছিঁড়ে সুষমা হঠাৎ পড়ে গেল···

'মা—' কমলার পরিত্রাহি এবং ভয়ংকর চিৎকারের শব্দ রাত্রির স্তব্ধতাকে নিষ্ঠুরের মতন ভেঙে চুরে তচনচ করে দিল।

সাত

কাল পরশু তবু একরকম গেছে ; কথাবার্তা হাসি কথা ফুটেছে মুখে—আজ বিকেল থেকে কমলাদের ঘরের চেহারা অন্য। কারও মুখে রা শব্দটি পর্যন্ত নেই। নীহার গোঁজ মেরে শুয়ে রয়েছে তো উঠবার নাম নেই। কমলা তাড়া দিয়েছে বার তিনেক। ডেকেছে, বুঝিয়েছে। 'তুই তো বড় হয়েছিস নীহার, বুদ্ধিসুদ্ধি হবার মতন বয়েস হয়েছে তবু কেন ছেলে-মানুষের মতন করছিস। কেন? দেখতেই তো পাচ্ছিস আমাদের অবস্থা। বাবার যদি আজ চাকরি থাকত...এই, এই নীহার—ওঠ।' নীহার ওঠে নি। কিছুটা আলগাভাবে শুয়েছিল ; কমলার কথা শুনে, একটা দু'টো ঠেলা খেয়ে আরও গোঁজ হয়েছে। শক্ত। কমলার সাধ্য কি তাকে ওঠায়। তবু কমলা বোঝাবার চেষ্টা করেছে। নিরাশ হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মা-র কাছে।

সুষমা রান্নাঘরের দরজায় হেঁট হয়ে বসে। তার চুলে রুক্ষভাব। আতেলা। উস্কোখুস্কো। দু'হাতের তালুতে গাল চাপা ; চোখ নিচে। সামান্য ঝুঁকে পড়া মুখের অল্প অংশ পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। গা-য়ে জামা নেই। কনুইয়ের ওপর পর্যন্ত খালি। ঝুলে-পড়া শাড়ির আঁচলের ফাঁক দিয়ে বগলতলার কাছের এক অংশ, বুকের সামান্য ভাগ দেখা যাচ্ছে।...মার গা-য়ের চামড়াতে কেমন ময়লাটে ভাব ধরেছে। যেন সাবান সোডার অভাবে এখানে ওখানে ময়লার দাগ পড়েছে ; দেখতে পাচ্ছিল কমলা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে একবার কুয়োতলার দিকটা দেখল কমলা। কি ভাবল। তারপর সরে এল সুষমার কাছে। 'মা মা, তুমিও

কি ওদের মতন অবুঝ হচ্ছ? পারুলটা সেই যে কোথায় গেল···মা!'

সুষমা জবাব দিল না, মুখও তুলল না; বসে রইল তেমনি চুপচাপ গাছের গুঁড়ি কি পাথরের মতন শক্ত হয়ে।

'মা!' কমলা আবার ডাকল নরম গলায়, মোলায়েম সুরে। 'তুমি অমন করো না। তুমি যদি অবুঝের মতন কর, নীহার করবে না কেন; পারুলের দোষটাই বা কিসে? মা, কমলা আস্তে তার হাত রাখল সুষমার নিরাবরণ বাহুতে; কনুইয়ের কাছে। সুষমা ঝটকা মেরে কমলার হাত সরিয়ে দিয়ে আবার তেমনি বসে রইল। কমলা এক পা পেছনে সরল, আবার ডাকল। সুষমা রইল তেমনি।

এই দিনের বেলাতেও যেন অন্ধকার নেমেছে। বাবা বেরিয়েছে খানিক আগে আর থাকতে না পেরে। পারুলটা কাঁদছিল; বাবার লাথি, মা-র হাতের থাপড় খেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে কুয়োপাড়ের কাঁঠাল তলার দিকে সেই যে গেছে আর ফিরছে না। ধমকানি খেয়ে নীহার রাগে অভিমানে শুয়ে শুয়ে ফুলছে। মা-র সঙ্গে কথায় কথায় এত বেশি সুর চড়ল যে, বাবা শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে গা-য়ে জামাটি চড়িয়ে বেরিয়ে গেল। কেবল কমলা একা যুক্তি দিয়ে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করল। বুঝল, এই রাগ এই অভিমান সাজে না আমাদের।

বাবার দিকে তাকালে মায়া হয় কমলার। বাবা আর পারছে না। শক্তি উদ্যম সাহস সব হারিয়ে একটা মানুষের খোলসের মতন আছে। অক্ষম হয়ে। ব্যর্থতার জ্বালায় পুড়তে পুড়তে বাবার ভেতরে আর কিছু নেই। সংসারে এই একটি মানুষ যাকে কত রকমেই না কমলা দেখল। আজ নিঃস্ব অক্ষম অপারগ সামর্থ্যহীনভাবেও দেখছে। এই অক্ষমতা

কি করে মানুষের স্বাভাবিক ভদ্রতা, সুষ্ঠুতা, ন্যায়বিচারের জ্ঞানটুকু পর্যন্ত ভুলিয়ে দিচ্ছে আশ্চর্য! মা, মা-ও তেমনি হয়েছে। মা-ও পারছে না নিজেকে মানিয়ে নিতে। এই অভাব দারিদ্র্যতার আসল রূপ মা দেখেনি কোনোদিন; আমি, নীহার, পারুলও নয়। অথচ দিন যত পার হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ—এমন কি স্বামী-স্ত্রী-বাবা-মা সন্তানের যে স্নেহ এবং শ্রদ্ধার সম্পর্ক তাও আলগা করে দিচ্ছে। স্বার্থপর বানাচ্ছে মানুষকে। নীহার তার নিজের কথাই ভাবছে। নিজের পেটের ক্ষিদে, পরার কাপড়-চোপড় সাজ-পোষাকে—এমন কি আয়েসে ঘুমোনোর জায়গাটা সম্বন্ধে পর্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছে। নীহার তাকে নিজের মতন করে ভাবতে শিখেছে। এ-ভাবনা মাঝে মাঝে কমলার মধ্যেও জাগে। অনেক সময় তিক্ত বিরক্তভাব এত বেশি প্রকট হয়ে প্রকাশ পায় যে—পরে সে-কথা ভাবলে কমলা নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ে। কমলা জানত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা এত আপন, এত ঘনিষ্ঠ, এত মনোরম যে সংসারের আর কোনো সম্পর্কের সঙ্গেই তার তুলনা চলে না। এ-সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অত্যন্ত নিবিড় এবং অন্তরঙ্গ। একে অন্যের দুঃখের দিনে পাশে দাঁড়ায়, এমন যে নিবিড় সম্পর্ক তাও কেমন করে ভেঙে যেতে পারে কমলা দেখেছে। এই বাড়িতেও অনেক আছে, সে-কথা না হয় থাক। বাবা-মার সম্পর্কের দৌড়টা এখন কোথায় এসে দাঁড়াচ্ছে, দাঁড়িয়েছে—তাও কমলার অদেখা নয়। মা তার সবটুকু শ্রদ্ধা হারিয়েছে বাবার ওপর। কমলা জানে তাব একমাত্র কারণ অভাব, অক্ষমতা। মা-র রূঢ় ব্যবহার, কর্কশ গলার কথা অনেক সময় কদর্য বিশ্রী মনে হয়। অশ্রাব্যও। মা-র ব্যবহারে ধৈর্যচ্যুতি পর্যন্ত ঘটে। কমলা তখন কেমন

স্বার্থপরের মন পায়। পরে সুস্থির হয়ে ভেবে দেখেছে, এ-সব যেন মা বলে না, মা-র ভেতরের অন্য কেউ বলে। দরিদ্র বিত্তহীন অক্ষম ভাগ্য কি ভাগ্যবিধাতা নামে কোনো এক অজানা অচেনা কিছু, যা মানুষের মনকে স্বাভাবিক বোধ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায়। এই সংসারের প্রতি, স্বামীর প্রতি, সন্তানের প্রতি মা হয়েও তাই রূঢ় ব্যবহার করতে আটকায় না। মা এখন আর মা নেই। তার মাতৃত্ব স্নেহ বাৎসল্য শ্রদ্ধা বুঝি এক কাচের পাত্র। দারিদ্র্য নামের কোনো এক শক্ত কঠিন বস্তুর আঘাতে তার সব কিছু ভেঙেচুরে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এখন মা-ই সেই দারিদ্র্যের রূপ নিয়েছে। মা এখন অভাবের মতন সত্য। কিংবা সন্তান স্বামী তার কাছে অনটনের মতন ভয়ানক কঠিন বাস্তব। কমলা মা-র বিকট এক রূপ—গোটা চিরুনির মাঝে মাঝে দাঁত-ভাঙা বিকৃতির মতন কদর্য ভয়াবহ বীভৎস আকার কল্পনা করতে পারছিল। এবং সকলে মিলেমিশে এক অন্ধকারের রূপ নিয়েছে—তা পর্যন্ত।

কাকে দোষ দেবে কমলা; কাকে! ভাগ্য কি—কমলা তার চেহারা দেখেনি। তার রূপ কল্পনা করতেও পারে না। না হলে এই বাড়ির রুমাবৌদির অবস্থা দেখে কি সন্ধ্যার চলাফেরা দেখে, চাঁপার মা-র নিত্যকারের বুক চাপড়ানো কান্না দেখে মোটামুটি একটা অবয়ব কল্পনা করে নিতে পারত। কমলা বুঝতে পেরেছে নন্দদা আসলে এক হীন চরিত্রের মানুষ। রুমাবৌদিও। নিত্য নতুন শাড়ি জামাটামা কেনার পয়সা কোথা থেকে আসে আগে জানত না কমলা; এখন জানে। আর এই যে রোজ নন্দদার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বিকেলে বেরুনো—তারও একটা মানে আছে। কমলা শুনেছে রুমাবৌদি রোজ যখন ফেরে, বেশ কিছু

পয়সা টাকা সঙ্গে আনে। নীহার বলেছে, সে নাকি দেখেছে। তাকে বলেছে সন্ধ্যা। 'জানিস দিদি, নন্দদা নাকি সায় দেয়।' নীহার অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কথাটা বলেছিল, কমলা তাকে ধমকে দিয়েছে। বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এখন কেন যেন সত্যি সত্যি কমলাব মনে হয়—রুমাবৌদি আর নন্দদার সম্পর্কটা এই। কমলা সেই থেকে সাবধান করে দিয়েছে নীহারকে।...'এ সব কথা কখনও শুনবি না। বাজে। আর সন্ধ্যারই বা কিসের এত দরকার পরের নাড়ি ঘাটবার?'

সেই থেকে কমলার মনে হয়, নন্দদা আর রুমাবৌদির সম্পর্কটা নিশ্চয়ই আগের মতন নেই। কিছুতেই নয়। এই দৃঢ় বিশ্বাস, গভীর প্রত্যয় কমলা মেনে নিয়েছে।

এ-বাড়ির সকল ভাড়াটের অবস্থা প্রায় এক। দু'মুঠো ভাতের জোগাড় হয়ত পাছার কাপড়ে টান পড়ে। নূন আনতে পান্তা ফুরোবার অবস্থা। তবু কিছু কিছু শখ-আহ্লাদ মেটে। রুমাবৌদির ঘরে দু'রকমের শাড়ি এসেছে, রেডিমেড নকল কর্ডের ব্লাউজ এবং জামার ছিট। অবিনাশ ক-দিন আগে কিনে দিয়েছে সন্ধ্যার শাড়ি, আজ সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যা আবার কি কি যেন কিনে আনল। সেই দেখেশুনে নীহারের মন খারাপ। মা-র কাছে কি যেন বলছিল, সুষমা গা করেনি সে কথায়। সেই থেকে গজর গজর করছিল নীহার। জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল বাবাকে। কমলাপতি তার কথার কি জবাব দিয়েছে; শুনে চুপ করে গিয়েছে নীহার। পারুলও বায়না শুরু করেছিল। অবুঝ মেয়ে পারুল বোঝেনি এ-বাড়ির সকলের ঘরে পুজোর জামা কাপড় উঠল অথচ তাদের এল না কেন? পারুল খানিক খ্যান খ্যান করেছে কমলার কাছে। কমলা বোঝাতে গিয়ে বিরক্ত

হয়েছে শেষ পর্যন্ত, বলেছে, 'বাবার হাতে এখন পয়সা নেই ; হলে আর দু'দিন পরে তোর জামা-কাপড় আসবে। খুব সুন্দর ফ্রক ; লিনেনের।' শুনে পারুল ধরেছিল কমলা-পতিকে, 'বাবা আমার জামা কবে আনবে ?'

কমলাপতি মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে না পেরে তক্তপোষের কোণে তুলে রাখা আধপোড়া বিড়ি ধরাল। পুরনো প্রায় পাতায় পাতায় খসে আসা পকেট-গীতাখানা নিয়ে চোখ রাখল তাতে।

বিপদ আপদ কি দুঃখের সময় এই পকেট গীতাখানা তাঁর সান্ত্বনার মাধ্যম। যেন এতদিন ধর্মটর্ম সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল একটু গোঁড়া রকমের ; এখন কমলাপতি বুঝেছেন মানুষের এই একটা দিক তুচ্ছ নয়—কমলাপতি এখন এই গীতা-সম্বল মানুষ হয়েছেন। বুঝেছেন, স্ত্রী সন্তান আসলে কেউ কারও নয়। এবং পারুলের এই হঠাৎ আক্রমণে কমলাপতির আগ্রহটা গীতার প্রতি বাড়ল। অত্যন্ত উদাস অনাগ্রহী ভাবে কমলাপতি নিরাসক্তের মতন চুপচাপ রইলেন।

'বাবা!' পারুল কমলাপতির হাঁটু ধরে নাড়া দিল, '…ও বাবা!'

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন কমলাপতি। শেষ পর্যন্ত পারুলের গলা চড়ল। '…বাবা, বাবা', প্রায় চিৎকারের সুরে ডাকছিল পারুল। যত জোর ছিল তাই দিয়ে ঠেলছিল কমলাপতিকে।

বিরক্ত হচ্ছিলেন কমলাপতি। তাঁর ধৈর্যের মাত্রা কমে আসছিল। অনীহার ভাব রইল না শেষ পর্যন্ত। ক্ষুব্ধতা অপ্রসন্নতা ক্ষিপ্ততা এবং বিকৃত মনের অসুস্থতা প্রকাশ পেল। পারুলকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গিয়েছিলেন কমলাপতি কিন্তু

সরাতে গিয়ে ধাক্কা লাগল জোরে। ছিটকে পড়ার মতন মেঝের ওপর পড়ল পারুল। কাৎ হয়ে। আর সেই সঙ্গে হঠাৎ এক চিৎকার। জোরে, পরিত্রাহি গলায় কেঁদে উঠল পারুল।

কমলা ছুটে এল। সুষমা ঢুকল ঝড়ের বেগে। তার পেছনে নীহার। সুষমা সামান্য ঝুঁকে পারুলকে তুলল; কটমট করে আগুন-জ্বলা চোখে তাকাল কমলাপতির দিকে। বোকার মত, বোবা সেজে কমলাপতি দেখছিলেন। এই সামান্য ব্যাপারে এতটা ঘটতে পারে ভাবতে পারেননি। আস্তেই সরাতে গিয়েছিলেন পারুলকে কিন্তু তাঁর বিরক্তি ক্ষুব্ধতা অপ্রসন্নতা তাকে ক্ষণিকের জন্যে অপ্রকৃতিস্থ করেছিল। ধাক্কাটা হঠাৎ লেগেছে। জোরে। পারুলের লেগেছে। এখন হতভম্ব বিস্মিত নির্বোধের মতন চুপচাপ বসে আছেন কমলাপতি।

'একটু লজ্জা করে না তোমার? ঘরে বসে পিণ্ডি গিলছ, আর আমার এই কচি মেয়েটাকে···' সুষমার গলা এত চড়ায় উঠেছিল যে, আচমকা বিষম খেল। চোখ দু'টো কপালে ওঠার মতন ভাব। কমলা ভয় পেয়ে প্রায় ছিটকে সরে এল। ধরল সুষমাকে। '···মা মা ওমা!' পারুল মুখ তুলল। সে কাঁপছে। নীহার ভয়-মাখা চোখে সুষমাকে ধরল। দরজার কাছে এতক্ষণ উঁকিঝুকি মারছিল ক-টি মুখ। তাদের মধ্যে থেকে ননীবালা ঢুকল আগে। আর লতার মা—পেছনে গুটি তিনেক বাচ্চা ছেলেমেয়ে। একটা মুহূর্তের মধ্যে কী যে হয়ে গেল, কমলাপতির চোখের সামনে আজব সময়; কিম্ভুত এক মুহূর্ত। বিস্ময়-চোখে বিস্ফারিত ভাবে কমলাপতি তাকিয়ে রইলেন।

সুষমার বিষম-খাওয়া, চোখ কপালে তোলার অবস্থা

বেশিক্ষণ রইল না। বার দুই হেঁচকি তোলার মতন করল সুষমা। সামান্য প্রকৃতিস্থতা দেখা গেল। সুষমা তার কথার শেষটুকু আবার তুলল কমলাপতির দিকে তাকিয়ে। '···কিছু দিতে পার না; পারছ না, মিষ্টি কথায় বললেই হত সে-কথা। তাই বলে এইটুকুন মেয়েকে তুমি লাথি মারলে! কেন, কেন—খাওয়াবার যার মুরোদ নেই, তার অত তেল কিসের? আমার হাড় জ্বালাচ্ছ বসে বসে। তার চেয়ে, তার চেয়ে···' সুষমা তার ডান হাতের অবশিষ্ট একগাছা শাঁখা দেওয়ালে ঠুকে, ভেঙে পারুলের মাথায় হাত রেখে হঠাৎ কেঁদে উঠল।

কমলাপতি নিথর স্তব্ধ কাঠ। বুঝতে পারছিলেন না, স্বপ্ন দেখছেন কিনা। মাঝে মাঝে স্বপ্নের ঘোরে এমন অনেক কিছু তিনি দেখেছেন। অনেকবার। কমলাপতি নিরুত্তেজ শান্ত বিস্ময় চোখে সব কিছু দেখছিলেন। কমলা, নীহার এমন কি পারুল পর্যন্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে অবহেলা ঘৃণা অশ্রদ্ধার চোখে। বাকি সকলের দৃষ্টিতে করুণার ভাব—যেন ওরা এই সংসারের মাথা কমলাপতিকে দেখছে না; অন্য কিছু প্রকাশ পাচ্ছে ওদের চাউনিতে। কমলাপতির মনে হল, তিনি বীভৎস কদাকার কুৎসিৎ এবং হিংস্র এক জন্তুর মতন হয়ে গেছেন। ওরা সকলে সেই আহত জন্তুর অক্ষম ক্ষিপ্ততার প্রকাশ লক্ষ্য করছে।

সেই বিকেল থেকে লেগে-থাকা অন্ধকার মোছেনি এখনও। বিকেল শেষ হল, সন্ধ্যা নামল; এ-বাড়ির অন্ধকার অন্ধকারই রইল। নীহার উঠল না। সুষমা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসেছিল, ননীবালা আর লতার মা অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে

তাকে সরিয়েছে। অনেকক্ষণ আলো জ্বলেনি এ-ঘরে। কমলা পারুলকে খুঁজেপেতে এনে এতক্ষণ কোলের কাছে বসিয়ে অনেক কথা বলেছে। বুঝিয়েছে। এখন কমলা উঠল আলো ধরাবার জন্যে।

অন্ধকারে দেখা যায় না কিছু। কমলা সাবধান সতর্ক-ভাবে দেওয়াল ঘেঁষে ঘরে ঢুকল। ডাকল, 'নীহার',…নীহার জবাব দিল না। পরে একটু শব্দ শোনা গেল মাত্র। কাতর আর্তনাদের মতন। কমলা সরে এল সামান্য। নীহারের গা-য়ে পা লেগে গেছে তার। '…কেমন করে যে শুয়ে আছিস!' অন্ধকারের মধ্যেই বলল কমলা। 'এমনি করে শুয়ে থাকলেই কি সব আসবে নাকি?' কমলা হাত বাড়িয়ে কুলুঙ্গী খুঁজছিল। '…ইস বাবারে, কী অন্ধকার! দেশলাইটা যে কোথায় খুঁজেও পাচ্ছিনা।'

আলো জ্বালল কমলা। ডিবেটা ধরাল। কালিমাখা ন্যাকড়ায় চিড়-খাওয়া লণ্ঠনের চিমনিটা সতর্কভাবে মুছে নিয়ে লণ্ঠন জ্বালল। তারপব থালায় করে খানিকটা আটা নিয়ে চলল রান্নাঘরের দিকে।

কমলাপতি যখন ফিরলেন, রাত তখন ন-টার কাছাকাছি। পারুল রান্নাঘরের দরজাব চৌকাট ধরে হাঁটুমুড়ে বসে রয়েছে। ভেতরে কমলাকে দেখতে পাওয়া গেল। সুষমা নেই। নিঃশব্দ পা-য়ে এগিয়ে এসে ঘরের ভেতরটা দেখলেন কমলাপতি। নীহার শুয়ে রয়েছে। সুষমা নেই। কমলাপতি সরে যাচ্ছিলেন; তাঁর পা-য়ের অল্প শব্দে পারুল বারান্দায় তাকাল। কমলাপতিকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল পারুল। আর তাকাল না। এই না-তাকানো, চোখ ফিরিয়ে নেওয়াটা

অত্যন্ত মর্মদায়ক মনে হল কমলাপতির কাছে। পারুল কী যেন বলল। কমলা ঘাড় ফিরিয়ে কমলাপতিকে দেখল। উঠেও এল। 'বাবা! হাত মুখ ধুয়ে নাও···এখন খেতে দেব।'

সুষমা কোথায় কমলাপতি জানেন না। দেখতেও পাননি। খেতে বসে একবার জিজ্ঞেস করবেন ভেবেছিলেন, তাও পারলেন না। পারুল বসেছে ডানপাশে। পাটিসাপটার মতন করে জড়িয়ে রুটি খাচ্ছে। কমলাপতি দু' টুকরো রুটি মুখে পুরতে পুরতে পারুলের আস্ত দু'খানা শেষ। কমলা আরও একখানা রুটি এনে দিল পাতে। 'একটু আস্তে আস্তে খা। কী রকম হাবাতের মতন যে খাচ্ছিস, ইস!' কমলা মৃদু তিরস্কার করল পারুলকে। কমলাপতি দেখতে পাচ্ছিলেন, পারুলের চোখ দু'টো কেমন অস্বাভাবিক বড় বড় লাগছে। পারুল একবারও তাকাচ্ছে না এ-দিক ও-দিক।

সুষমা কখন এসে দাঁড়িয়েছে, কমলাপতি দেখেননি। তৃতীয় রুটিখানাও শেষ করে পারুল তাকিয়েছিল কমলা-পতির থালার দিকে; দু' টুকরো রুটি কমলাপতি তুলে দিলেন। তাও খেয়ে পারুল এখন রুটি চাইছে। আরও।

'এখন ওঠ। বেশি খেলে পেট খারাপ হবে।' কমলা এসে হাত ধরে টানল পারুলের।

পারুল গোঁজ হয়ে বসে রইল। উঠল না।

'ওঠ না,' কমলা ধমক দিল, 'আর নেই।'

কমলাপতি উঠছিলেন। বললেন, 'যদি থাকে তো, এক-আধ খানা দে।'

'না; নেই। আমরা খাব না?'

'পারুল, ওঠো।' কমলাপতি নরম গলায় বললেন।

পারুল উঠল না।

'এবার কিন্তু টেনে সরিয়ে দেব পারুল', কমলা ভয় দেখাল। 'রাক্ষসের মতন করিস না বলছি।'

'রুটি দে!'

'আর নেই।'

'আছে।'

'আছে?' কোথা থেকে ছুট করে এল সুষমা। পারুলের পিঠে মারল। '...হাবাতের গুষ্টি, সব খা, খেয়ে খেয়ে সাফ কর।' সুষমা ভয়ানক আক্রোশে পারুলের মাথার চুল মুঠি করে চেপে ধরল। 'ওঠ, ওঠ রাক্ষুসী, ওঠ...' সেই সঙ্গে ধুপধাপ কিল চড় চাপড়।

কমলাপতি এসে ধরলেন সুষমাকে। সুষমা হাত ঝামটা দিয়ে সরিয়ে নিল। পারুলের চুলের মুঠি ধরে টেনে খানিক নিয়ে এল। পারুলের কী পরিত্রাহি চেঁচানি।

'মর মর, মরে যেতে পারিস না? নাওদরা সাপ পেটে গেছে হারামজাদীর...' সুষমা ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে পাগলের মতন হাত চালাচ্ছিল পারুলের ওপর।

আবার এখানে ভিড় জমল। ভিড়ে এখন লোক বেশি। পারুলকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে সকলে; সুষমাকে টানবার —কিন্তু সুষমা ক্ষেপে গেছে। '...ওকে আমি শেষ করব। মেরেই ফেলব আজ।' সুষমার মাথার চুল আলুথালু হয়ে নাক মুখ ঢেকে ছড়িয়ে নেমেছে। তার ফাঁক দিয়ে বড় বড় দু'টো চোখ·রক্তের বর্ণ ধরেছে দেখা যাচ্ছিল। ভয়ানক এক বিভীষিকার মতন। কমলাপতি শেষ পর্যন্ত এঁটো হাতে গিয়ে জাপটে ধরলেন পারুলকে। ক্ষিপ্ত উন্মত্ত সুষমার দু' একটা আচড় থাপড় কিল পড়ল তাঁর ওপর। কমলাপতি পারুলকে বুক দিয়ে ঢেকে তুলে নিলেন। কী যেন হয়ে গেল, কী যে, কমলাপতির গা-মাথা কেমন ঘুরছিল।

'সুষমা সুষমা থাম।' কমলাপতির গলার স্বরে ঈষৎ ভেজা ভাব। '...হয়েছে হয়েছে, আর মেরো না মেয়েটাকে, সুষমা।' কমলাপতি তার বাষ্পাচ্ছন্ন অল্প আর্দ্র হয়ে আসা চোখ তুললেন, 'তুমি আমাকেই মার, সুষমা। হ্যাঁ, আমাকে। তোমার যত খুশি কিল চড় লাথি মার আমার ওপর; আমি সইব, তবু তুমি থাম...' কমলাপতির কণ্ঠার কাছে ভারী মতন কিসের এক দলা উঠে এসে গলা চেপে দিল। চোখ ভিজেছিল তাঁর; কাঁপছিল অত্যন্ত দ্রুতভাবে। মাথা ঝুলে পড়ল। পারুলকে তিনি শক্ত করে. দৃঢ় বন্ধনে বুকের কাছে ধরে রইলেন।

মুহূর্তের মধ্যে নীরবতা নামল। সুষমা চুপ-চোখে কাঁদছে। কমলা আঁচল তুলে চোখ মুছছে ঘন ঘন। নীহার ঘাড় নিচু করে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছে। আর এই ভিড়ের প্রত্যেকটি মানুষ স্তব্ধ অটল নিঃসাড়।

আট

আশ্বিন গিয়ে কার্তিক মাস পড়েছে। দিন ছোট হয়ে এসেছে অনেক। দুপুরের দিকে যা একটু রোদের উত্তাপ। দেখতে দেখতে বেলা গড়ায়, সূর্য আর বেশিক্ষণ মাঝ-আকাশে থাকে না। বিকেলের ছায়া নামার সঙ্গে সঙ্গে কনকনে ভাব হয় আজকাল। তারপর একটু আধটু জোরে হাওয়া দিতে শুরু হল কি শীতের ভাবটা বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। হিম পড়তে শুরু হয়েছে এখনই। বাতাসে অল্প কুয়াসার ভাব। সকালে রীতিমত শিশির পড়ছে আজকাল।

কথায় বলে 'কার্তিকের বেলা, কাৎ হলেই গেলা।' দুপুরের হেঁসেল তুলে, ধোয়ামোছা করে সুষমা একটু গড়িয়ে নেবার জন্য কাৎ হয়েছিল কি ঘুমিয়ে পড়ল। সে-ঘুম যখন ভাঙল তখন শেষ বিকেল। উঠতে ইচ্ছা হল না সুষমার। কি ভেবে আঙুল গুণল।…এই ছ-দিন হল চিঠি দেওয়া হয়েছে। গতকাল দুপুর থেকেই আশা করে বসে আছে সুষমা—মণিঅর্ডার আসবে। আজও দুপুর গেল—কোনো আশাই আর দেখা যাচ্ছে না। পুজোর আর মাত্র পাঁচটি দিন বাকি। শুধু সুষমা কেন, মেয়েগুলোও সেই আশায় দিন গুনছে। শেষ পর্যন্ত কী হবে ভগবান জানেন। যদি কোনো গণ্ডগোল না হয়, এই চিঠি পায়, তা হলে ছোট বোনের অনুরোধ কি ফেলতে পারবে। কি জানি, ভাগ্য যদি খারাপ হয়তো চিঠি নাও পেতে পারে। সুষমা অনেক কথাই ভাবছিল। একখানা চিঠি তাও কতবার বলে বলে তবে লেখাতে পেরেছে কমলাকে দিয়ে। তবু ভাগ্যি মনে

পড়েছিল এই অসময়ে। তাই না আজ একটু ভরসা করতে পারা যাচ্ছে।

কমলাও হয়েছে তেমনি।···তোরা যে গরীব হয়ে গেছিস, এখন প্রায় ভিখিরীর মতন অবস্থা—তাও কিছুতেই মাথা নোয়াবি না। আগের দিনের অবস্থা আমাদের নেই। তোর বাবা এখন অক্ষম, প্রায় পঙ্গুর মতন। শূল বেদনায় ধরেছে, দেখতেই তো পাচ্ছিস কেমন কষ্ট পাচ্ছে। শুকিয়ে শুকিয়ে এখন কাকলাসের মতন হয়েছে। কাজকর্ম করার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। তার মধ্যে পুজো এসে গেল, আমরা মা-বাবা হয়ে তোদের গা-য়ে এক চিলতে নতুন কাপড় তুলে দিতে পারব না—সে-টা যে আমাদের কত বড় দুঃখের হবে তোরা বুঝবি না···। সুষমা ছ' দিন আগে ভেবেছিল এই কথা··· কী আর হবে। আমাব দিদি দাদাবাবু, আমি লিখছি—তোদের মান তাতে যাবে না।'

'আমি পারব না ও-সব লিখতে-টিখতে।' কমলা গোঁ ধরে থাকল।

'তুই তবু একটু গুছিয়ে লিখতে পাববি। আমার মাথার ঠিক নেই, কিসে কি বলব—আর কাউকে দিয়ে কি হয়?'

'নীহারকে বল না।'

'তোর যেমন কথা। এমনিতে দেখতে পাচ্ছিস না? ওকে দিয়ে হবে না, কুমু। দে মা, দু'টো কথা বইত নয়।'

নীহার ঘরে ছিল না। সুষমা পারুলের মাথা খুঁটতে বসে কমলাকে বার বার অনুরোধ করেছে। 'তুই দেখিস নি। খুব বড় অবস্থা আমার দিদির। জমি জায়গা বাড়ি ঘর—কত। মনে তো করছি পঞ্চাশটা টাকাই চাইব। কোনোদিন তো চাইনি······চাইলে দেবে। তবু তোদের এক আধখানা ভাল শাড়িটাড়ি···'

'থাক, তোমার বোনের টাকার জিনিস আমি পরব না।'

'আচ্ছা রে আচ্ছা'……সুষমা মেয়ের অকারণ গোঁ দেখে অল্প হাসল। '…তুই তো চাকরির চেষ্টাই করছিস। পেলে তোরটা তুই কিনে নিস। দে-মা…' সুষমা খুব নরম অনুনয়ের গলায় অনুরোধ করল, 'দু' ছত্রের একটা চিঠি লিখে দে।'

শেষ পর্যন্ত রাজি হল মেয়ে। কাগজ কলম নিয়ে বসল। 'বল, কী লিখতে হবে তোমার বড়লোক দিদিকে।'

'পাঠ, ঠিকানা-টিকানা লিখেছিস ?'

'হ্যাঁ'

'তা হলে লেখ। হ্যাঁ, কী পাঠ লিখলি শুনি ?'

'শ্রীচরণেষু…'

'না না, শ্রীচরণকমলেষু লেখ। আমরা সাবেক কালের মানুষ। তা ছাড়া দিদি আবার…'

'লিখেছি লিখেছি', কমলা লাইনটা কেটে দিয়ে তার নিচে গোটা গোটা অক্ষরে লিখল, শ্রীচরণকমলেষু। 'নাও বলো।'

'লিখেছিস ? হ্যাঁ লেখ।…এই যে দিদি, বহুকাল হইয়া গেল আপনাদের মঙ্গল সংবাদ অবগত নহি। আশা করি ভগবৎ কৃপায় কুশলেই আছেন…' বলে সুষমা থামল। জিভে অদ্ভুত শব্দ করে দুই আঙুলে মাথার চাঁদি খুঁটল। উকুন বাছার মত চুল চেপে আঙুল টানল। চোখের সামনে নিয়ে দেখল হাত। তার ভুরু অল্প কোঁচকান—যেন সুষমা কি বলবে ভেবে উঠতে পারছে না।

কমলা তাড়া দিল। বোকার মত হাসল সুষমা, 'কি যে ছাই বলি·· তুই না হয় একটু গুছিয়ে গাছিয়ে…'

তাতেও অমত কমলার। শেষ পর্যন্ত সুষমা যা পারল

বলল ; অতিরিক্ত দু' চার কথা কমলা নিজের মন থেকে লিখে চিঠি শেষ করল।

সেই থেকে পারুল রোজই একবার করে সুষমাকে জিজ্ঞেস করে, 'মাসির টাকা আসেনি মা ? কবে আসবে ?'

'আসবে, আসবে।' সুষমা সান্ত্বনা দেয়। 'কাল পরশু ঠিক এসে যাবে দেখিস।'

আলসেমী ভাব কাটাতে অনেকক্ষণ লাগল সুষমার। চিন্তায় চিন্তায় মাথাটা পর্যন্ত কেমন খালি খালি লাগে। পরিশ্রমও আর সয় না। অল্পতেই মাথার ভেতর কেমন করে ওঠে। ঘুমুলে টুমুলে শরীরের অবসন্ন, ক্লান্তির ভাব আর যেতে চায় না। উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়াল সুষমা। ও-ঘরে কমলাপতি বসে বসে মুখ-মাথা নিচু করে পা-য়ের নখ খুঁটছেন। পারুল লতাদের ঘরের দোর গোড়ায় বসে লতার ছোট দুই ভাইবোনের সঙ্গে খেলছে না কি করছে— বোঝা যাচ্ছে না। আরও খানিক এগিয়ে এসে সুষমা পারুলকে ডাকল।

মন্টি আর ঝুণ্টুর সঙ্গে খেলছিল পারুল ; সুষমার ডাক শুনে উঠে এল।

'নীহারকে ডাক তো।'

'দিদি নেই।'

'নেই ? কোথায় গেল আবার ?'

পারুল রাস্তার দিকে তাকাল, বলল, 'কার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যেন কথা বলছিল ওখানে।'

'কার সঙ্গে ?' সুষমার গলার স্বর অল্প ঝাঁঝের মতন।

'চিনি না।'

'এ-পাড়ার ছেলে ?'

পারুল বলতে পারল না কিছুই।

হঠাৎ এক অস্থিরভাব, সামান্য সংশয় এবং শংকার ছায়া উঠল সুষমার চোখে। বারান্দা ছেড়ে উঠোনে নেমে এল সুষমা অত্যন্ত উদ্বেগ এবং ব্যাকুলতা নিয়ে। সন্ধ্যাদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ননীবালাকে শুধলো। নীহার নেই সেখানে।

কমলা উঠব উঠব করছিল অনেকক্ষণ থেকেই। বার দুই তার ওঠার ভাবভঙ্গি দেখে মন্দিরা ছোট ধমকের গলায় তাকে বসাল, 'অত তাড়া কিসের রে তোর? বোস। চা খাবি আর একটু?'

'না মন্দিরাদি; এই তো খেলাম। তুমি যে বড় জামাই আদর শুরু করলে', কমলা একটু রসিকতা করে মন হালকা করতে চাইল। কিন্তু তার ইতস্তত আর অস্থির ভাবটা কাটছে না কিছুতেই।

আজ রবিবার। কমলা জানত মন্দিরাদি আজ বাসাতেই থাকবে। দিন দুই এসেছিল আগে; দেখা হয়নি। আসা যাওয়ার ব্যাপারে এক সমস্যা। ঘরে পয়সা নেই; এ-সপ্তাহের রেশন পর্যন্ত না তোলার অবস্থা ছিল। গতকাল শেষ পর্যন্ত মা ব্যবস্থা করেছে। ধারের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। অবিনাশ কাকা, নন্দদার কাছে ধার করতে করতে এখন আর চাইবার অবস্থা নেই বাবার। চাঁপার মা, রুমা বৌদি, মাসিমা—কেউ বাদ যায়নি মা-র হাত থেকে। এ-সপ্তাহের রেশন ওঠে না; শেষ পর্যন্ত মা নন্দদাকে ধরে ব্যবস্থা করেছে। পুজোর আগেই মণিঅর্ডার আসবে সেই ভরসা দেখিয়ে তবু রেশনটা ঘরে তুলল মা। কমলা নিজেও রুমা বৌদির কাছে হাত পেতেছে। এক টাকার মতন হয়েছে এর মধ্যেই। সন্ধ্যার কাছেও আনা ছয়েক। কমলা তার হাতের ছোট রুমালের

গিঁটটা চেপে টিপে দেখল। আনা চারেক আছে এখনও। নিতাইয়ের কথা মনে পড়ল কমলার। কাল সকালের দিকে একবার বাসায় এসেছিল। বাবার সঙ্গে কি সব কথা বলল। বাড়িওলার সঙ্গে নিতাইয়ের খাতির আছে। বাবার ঘরটা এবার ছেড়ে দেওয়া হবে। একটা ঘরের ভাড়া জোটে না, ছু-ছু'টো ঘর নিয়ে কেন আর খানিক ঋণের বোঝা বাড়ানো। নিতাই নাকি বলেছে, বাকি ভাড়ার অত টাকা দিতে হবে না, কমটম করে মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে দেবে। অনেকক্ষণ গল্প করল নিতাই, কমলা বার ছুই তিন দরজার কাছে গেছে। ঘুরে ঘুরে। কমলার খুব খারাপ লেগেছে—একজন লোক-টোক এলে এক কাপ চা পর্যন্ত দেবার উপায় নেই।

আজও বেরুতে গিয়ে দেখা। কমলা ভাবতে পারেনি এই বেলা আড়াইটে কি তিনটের সময় নিতাইকে পথে দেখতে পাবে। নিতাইও বেরুচ্ছিল সম্ভবত। জামা কাপড় দেখে তাই মনে হয়েছিল কমলার। কমলাকে দেখে একটু হাসল নিতাই, '···এই ভর ছুপুরে কোথায় ?'

'শ্যামবাজারে। আপনি ?'

'আমি একটু হাতিবাগানের দিকে যাব।'

তারপর চুপ। কমলা কি ভাবল, বলল, 'ফিরতে ফিরতে আপনার নিশ্চয় রাত ?'

কথাটা নিজেই কাছেই কেমন উদ্দেশ্যমূলক শোনাল। অস্বস্তি এবং বিব্রতভাব মেখে কমলা মুখ নিচু করল লজ্জায়।

'না-না' ; নিতাই বুঝি কমলার কথার অর্থ ধরতে পেরে বলল, 'চারটে সাড়ে চারটার মধ্যেই ফিরব।' আপনি ?'

কমলা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না। বুঝতে পারছিল নিতাই তার দিকে তাকিয়ে আছে—তার চোখের

চাউনিটা কেমন রূপ নিয়েছে কে জানে। কমলা চোখ তুলল না। হেঁটে এল আরও কয়েক পা। একবার সামান্য কোণাকুণি তাকাতে গিয়ে আবার থামল। নিজের দিক থেকে হয়তো এমন কিছু বলা দরকার, যাতে নিতাই অন্য কিছু মনে না করে। নিতাই তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটছে। কমলা সামান্য অস্বস্তির ভাব অনুভব করছিল; শেষে মৃদু, নরম গলায় কিছু বলল।

কমলা অন্যমনস্ক, সামান্য অভিভূত। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা তার মনে পড়ছিল।···নিতাই এসে দাঁড়াবে পাঁচটায়। ঠিক মোহনলাল স্ট্রীটের মুখে। কমলা তার মনের অল্প বিচলিত এবং উৎকণ্ঠার ভাব অনুভব করতে পারছিল। নিতাই সম্বন্ধে আজকাল কেন যে এমন হয় কমলার—যেন মনে মনে নিবিড় অন্তরঙ্গ একান্ত এক সম্পর্কের কথা ভাবতে তার ভাল লাগে। মাঝে মাঝে দৈন্য অনটন অভাব দারিদ্র্য নিয়ে যখন হতাশ হয়ে পড়ে, তখন নিজেকে অত্যন্ত একাকী মনে হয় কমলার। ভয়ঙ্কর এক নিঃসঙ্গতা তাকে আচ্ছন্ন করে। অত্যন্ত পীড়িত, কাতর মনে হয় নিজেকে। এ-সময় কমলার ভাবনা যদি নিতাইকে ছুঁতে পারে; সে বেঁচে যায়। কমলা তখন নিতাইকে ডাকতে চায়। ঘরের মানুষের মত, পরম আত্মীয় মনে করে কমলা ডাকে···ডাকে—তার মন, হৃদয়, মনের নিঃসঙ্গতা, নিঃস্বতা, চঞ্চলতা নিয়ে হাত বাড়াতে চায়। যেন এই মানুষটা তার অসহায় একক জীবনের একমাত্র বান্ধব। এই ভাবনা কমলার কাছে সুখের মতন। নিজের মনের সেই প্রশান্ত সুখ, অনুভূতি, আবেগ কিছু সময়েব জন্য কমলাকে অন্য এক সুষমা দেয়। শান্তিও।···অথচ নিতাই আমার কে? কেন এক অনাত্মীয় পুরুষের প্রতি আমার

মন দুর্বল—কমলা নিজেকে প্রশ্ন করতে গিয়ে বিব্রত হয়।··· অন্যমনস্ক, অভিভূতের মতন কমলার চোখ এই ঘরে কি যেন খুঁজছিল; জানলার পর্দার পাশের মলিন আলোর ছোপ দেখে সময় ধরতে চাইছিল···

'কমলা।'

কমলা এতক্ষণ যেন এক হৃদয়াবেগের ঘোরে সামান্য বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল; এখন অল্প চমকানো চোখ তুলে মন্দিরার দিকে তাকাল।

মন্দিরা বসল কমলার পাশে। তক্তপোষে। 'কি ভাবছিস?'

কিছু যেন বলতে চাইল কমলা; বলল না। তার মুখ-চোখের অল্প চমকানো ভাবের মধ্যে মলিন একটু হাসির আভা ফুটল। বোকামির মতন।···কিছু না, কমলা মাথা নেড়ে ইশারায় বলল।

এই ঘরের সব কিছু এখন স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারছে কমলা। নিষ্প্রভ আলোর মলিন আভা, অত্যন্ত মিহি ধরনের—জড়িয়ে রয়েছে এই ঘরে। এই আলোয় ফিকে হলুদের ভাব। এই রঙ···এই রঙ—কমলা কোথায় যেন এমনি রঙ দেখেছে, ভাবতে চেষ্টা করল। তার ভুরু অল্প গুটলো, কুঞ্চন পড়ল নাকে; কপালে কয়েকটি রেখার জটিলতা। মা-র কথা এতক্ষণে মনে পড়ল কমলার। মা-র শরীরও রক্তশূন্যতায় এমনি ফ্যাকাসে রঙ ধরেছে। জোরে নিশ্বাস ফেলতে গিয়েও তা চাপল কমলা। অস্বস্তিকর এবং বিষণ্ণের মতন লাগল হঠাৎ। তার বুকের কাছে এসে নিশ্বাস জমল। জমে দলা পাকানো মতন লাগল। কমলা অনুভব করতে পারল, তার মনের তলার অন্ধকারে ক্ষীণ সূক্ষ্ম কান্নার মতন কিছু জমেছে; সুখ কি আনন্দের ক্ষণিক অনুভূতি দিয়ে তাকে ঢাকা যায় না···

'কমলা।'

ক-টি মুহূর্ত ভীষণ নিস্তব্ধতা ছিল ; এখন এই ঘরের ফিকে হয়ে আসা হলদেটে আলোয় শূন্যতা স্তব্ধতা অতি ক্ষীণ ঝাপসা ভাব কেটে লহমায় একটু আলোমত লাগল। কমলা তার আড়ষ্টতা সংকোচ কাটিয়ে সামান্য বিহ্বল চোখ তুলে তাকাল।

'তোর বাবা কি এখন একেবারেই বসে ?'

হ্যাঁ, কমলা মাথা নাড়ল।

'পড়াশুনা করলে...' মন্দিরা থেমে একটু কি ভাবল, 'অন্ততঃ ম্যাট্রিক ট্যাট্রিক পাশ করলেও সহজে ঢুকিয়ে দেওয়া যেত। ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েই ছেড়ে দিলি...'

'আর সম্ভব হল না মন্দিরাদি। সংসারের যা অবস্থা... বাবা পারত, এখন আবার শূলের না কিসের ব্যথা হয়েছে... মাঝে মধ্যেই ওঠে...', কমলা চুপ করল। তার মন অত্যন্ত ভীরু হয়ে পড়েছে, হতাশার একটু ভাব জমছে। শেষ পর্যন্ত মন্দিরাদি কি বলবে, হয়ত নিরাশ করবে, বলবে, এই বিদ্যেয় কি চাকরী তোকে দেব ? ভেবে কমলা ভয় পাচ্ছিল, যেন এই কথাটা আজই সে শুনতে চায় না। এখনই হতাশ হতে তার ভয়ানক ভয়।

একটু নড়ল কমলা। কোলের ওপরকার শাড়ির কুচি দেওয়া অংশটা ঝাড়বার ভঙ্গি করল, 'আজ তা হলে উঠি মন্দিরাদি, অন্যদিন বরং আসব।'

'বোস না আর একটু, আবার চা-য়ের জল বসালাম।' মন্দিরা উঠল। কমলার সামনের এঁটো প্লেট আর চা-য়ের কাপ তুলল, 'বেশি দেরি হবে না, এক মিনিট।'

মন্দিরা দরজার বাইরে গেল ; কমলা তবু যেন স্বাভাবিক হতে পারল না। সামান্য বিষণ্ণ এবং বিহ্বলতার ভাব এখনও

আছে। এই ঘরের চার পাশটায় চোখ বুলল কমলা। ঘরটা ছোট নয়, বড়ও না—মাঝামাঝি ধরনের। লম্বায় একটু বেশি। চাপা মতন। বড় টিপয় ধরনের এক টেবিল দেওয়ালের মাঝামাঝি জায়গায়। তার ওপরে ক-টি বই, কিছু কাগজ-পত্র, খাতা। খানিক ওপরে আলোর সুইচ। উঁচুতে বালব। দু'টো ক্যালেণ্ডার ঝুলছে সুইচবোর্ডের দু'পাশে। এ-পাশের কোণের দিকে গাঢ় নীল ঢাকনাতে ঢাকা একটা ট্রাঙ্ক, তার ওপর সুটকেস। ঝালর লাগানো একটা পাখা রয়েছে ওপরে। প্রায় খাট ছুঁয়ে আলনা। দেওয়াল-আলমারী রয়েছে পুবের দিকে। তার পাল্লার একটা কাচ ভাঙা। কিছু ওষুধপত্রের শিশি, তেলের বোতল, স্নো-পাউডার, তার কেস, আয়না-চিরুণী মায় সিঁদুরের কৌটো পর্যন্ত আছে। তিনটি জানলা এ-ঘরে। তার পর্দাগুলো নেটের মত কাপড়ের। দু'টো পুরো ঢাকা রয়েছে খোলা অবস্থায়, একটা অল্প গুটনো। অন্য এক জটিল চিন্তা কমলাকে সামান্য আচ্ছন্ন করল। কেন মন্দিরাদি, তোমার স্বামী-সংসার থাকতে, জীবনের সুখ বিসর্জন দিয়ে কি সুখে তুমি একলা থাক? কী-ই বা তোমার লাভ। কি তুমি পেয়েছ, মন্দিরাদি—মন্দিরা যেন এতক্ষণ এক পাথরের মূর্তির মত ছিল কমলার চোখে; সুন্দর হয়ে। এখন ভেঙেচুরে কেমন কদর্য, ঘৃণার রূপ ধরল। কমলার মন, ভাবনা তার কল্পনার চোখ পর্যন্ত কেমন গুটিয়ে এল। চোখ বুজল কমলা।

এতক্ষণ রোদের একটু অংশ পর্দা ছুঁয়ে শিকের গা-য়ে লেপটে ছিল; এখন তাও নেই। কমলা আবার, হঠাৎই অন্য এক চঞ্চলতা অনুভব করল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মন্দিরা চা-য়ের বাটি নামিয়ে নরম করে একটু হাসল।

'আবার কেন চা করতে গেলে, মন্দিরাদি? একবার তো খেলাম।' কমলা হঠাৎ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হতে চাইল।

'হু' চুমুক খেয়ে নে। আমার আবার চা খাওয়ার সময় এখন।'

কমলা চা-য়ের বাটি তুলে নিয়ে চুমুক দিল। মাথা নিচু অবস্থায় ভূরু-ছুঁয়ে তাকাল, 'এখন ক-টা বাজে বলতো?'

'ক-টা আর হবে, বড় জোর সাড়ে চার ··'

'সাড়ে চার!' কমলা যেন সামান্য চমকাল।

'কেন?' তোর কি যেতে ভয় করবে?'

'না না। কি জানো মন্দিরাদি, আমাদের ওই রাস্তাটায় সন্ধ্যের দিকে যেতে কেমন গা ছমছম করে।'

চা-য়ের বাটি হাতে নিয়ে মন্দিরা উঠল। বইয়ের পাশে রাখা হাতঘড়িটা দেখল। 'না না, সন্ধ্যে লাগতে এখনও দেরি। চারটে পঁচিশ এখন।' মন্দিরা ফিরে চেয়ার টানল, বসল তাতেই। 'রোববারে দক্ষিণেশ্বরের বাসে ভয়ানক ভিড়। তুই বরং একটু দেরি করে গেলে জায়গা পাবি।'

'জায়গার কথা আর বলো না তুমি, মন্দিরাদি। ও-বাসের অবস্থা সব সময়েই এক। এখন গেলে তবু বেলায় বেলায় যেতে পারব।' কমলা চা-য়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল। 'আমি কিন্তু এই সপ্তাহেই আবার আসছি।'

'আসিস।'

কমলা ভেবেছিল তার দেরি হয়ে গেছে অনেক। বাইরের মরা বিষণ্ণ আলোয় তার ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছিল।··· হয়ত পাঁচটা বেজে গেছে। মন্দিরাদির ঘড়ি স্লো-ও হতে পারে। রাস্তায় বেরিয়ে কমলা জোরে পা চালিয়েছিল। তার মনে সংশয় সন্দেহ ছিল কিন্তু প্রায় এক সময়েই দু'জন

পৌঁছেছে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে। দু' চার মিনিটের যা তফাৎ। আসতে আসতে দূর থেকেই নিতাইকে দেখতে পেয়েছিল। অল্প উদ্বিগ্নতা ব্যস্ততা সংশয় ছিল ; পরে জানতে পেরে একটু যেন স্বস্তি পেল।

কমলার এক মন সায় দিচ্ছিল, অন্য মন গররাজি। একটু ইচ্ছে করছিল, তবু না করল কমলা। দোকানে টোকানে চা খেতে তার কেমন সংকোচ লাগে এখন। বিশেষ করে এই সময়ে, নিতাইয়ের সঙ্গে।

'এইমাত্র খেয়েই বেরুলাম। তাও আবার পর পর দু' কাপ।' কমলা তার অনিচ্ছা জানাতে গিয়ে সামান্য কুণ্ঠিত হল।

'তা হলে থাক।' নিতাই কমলার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল।

যেন দোটানার মধ্যে পড়েছে কমলা, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। 'অবশ্য আপনি যদি খেতে চান···'

নিতাই চোখ ফেরাল কমলার দিকে। 'যে বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম, তাকে পাইনি। খানিক বসে থেকে, হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম।'

'চা খাননি আপনি ?'

'না।'

'তা হ'লে চলুন।'

ছোট কেবিন। দরজার পরদা ঝুলছে ; তার রঙ গাঢ় সবুজ—দু'পাশে নক্সাকাটা স্ট্রাইপ। ভেতরের টেবিলটা একটু লম্বা ধরনের। চারটি চেয়ার আছে—দু'টি করে একপাশে। মাথার ওপরে ছোট এক পাখা ঘুরছে। তার শব্দ চাকভাঙা

মৌমাছিদের কান্নার মতন। কেবিনের অনুচ্চ পার্টিশনের মাথায় টিউব লাইট ; তার আলো জলো কালির মতন পাতলা অথচ উজ্জ্বল। মাঝখানে রইল টেবিল ; দু'জন দু'পাশে বসল। মুখোমুখি। কমলা তার আঁচল ঠিক করে নিল। শাড়িটা সামান্য গুটনোর ভঙ্গি করতে গিয়ে পায়ের পাতা ঢাকল। টেনে। ডান হাতটা টেবিলের ওপর পাততে গিয়ে কনুই ভাঙল। নিতাইয়ের হাতে আধা শেষ করা সিগাবেট জ্বলছিল। আরও ক-বার টেনে ধোঁয়া ছাড়ল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরল এই কেবিন। চোখবন্ধ অন্ধকারের মতন এই এই ধোঁয়া ছডাচ্ছিল, ঘুরছিল, পাক খেয়ে খেয়ে ভাসছিল। মিহি সুক্ষ্ম সাদা ধোঁয়া। কমলা এই ধোঁয়া ছিঁড়ে নিতাইয়ের দিকে তাকাল। হালকা ফিকে নীলচে ভাব-ধরা আলোর সঙ্গে মিশেছে অত্যন্ত মিহি সাদাটে ধোঁয়া—তার মধ্যে নিতাইকে—হ্যাঁ, নিতাইয়ের চোখ, মুখ, কপাল, নাক, তার চোখের ওপর পাতা অল্প নামানো, নিচে তাকানোব ভঙ্গিতে ; সামান্য চাপা গাল, থুতনির ভাঁজ, ভুরুর বঙ্কিম রেখা, প্রশস্ত কপাল, টানা টিকলো নাক সব কিছু দেখে কমলার কেমন আচ্ছন্নের মতন লাগল। অদ্ভুত এক হৃদয়াবেগ অনুভব করতে পারছিল কমলা। অল্প মোহের মতন কেমন এক ভাব জড়াল তার চোখে।

ক-মুহূর্তের নীরবতা। কমলার মন কোথায় যেন এক মুহূর্ত থেমেছিল, সামান্য অন্যমনস্কতার ভাব ফুটেছিল ; এতক্ষণে কমলার মনে হল, কত সময় ধরে যেন তারা নিশ্চুপ। এই ছোট ঘরের সময় অতি দ্রুত চলছে।

'আপনার জন্য কিছু বলি ?' নিতাই ছাইদানীর সরু ঢালু-মতন জায়গায় সিগারেটটা টিপে নিভিয়ে কমলার দিকে তাকাল।

মানা করতে গিয়েছিল কমলা, তার আগেই বয়কে অর্ডার দিল নিতাই।

লজ্জা এবং কুণ্ঠার মধ্যে পড়ল কমলা। বলল, 'আমার জন্য কেন আবার…'

'তেমন কিছু না। আমি খাব আর আপনি বসে বসে দেখবেন, সে-টা কি ভাল হবে?' নিতাইয়ের মুখে প্রসন্ন সুস্মিত একটু হাসি, 'আর অতটা স্বার্থপরই বা ভাবছেন কেন আমাকে?'

'আমি কি তাই বলেছি নাকি?' ইতস্তত এবং কুণ্ঠিত ভাবের মধ্যেও প্রশান্ত ভঙ্গিতে ঘনিষ্ঠভাবে তাকাল কমলা, 'খানিক আগে খেয়েছি, তাই বলছিলাম…'

'আধ কাপ চা খেলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। তা ছাড়া…' বয়কে দেখে মাঝপথে থামল নিতাই। একটা প্লেট আর চা-য়ের পেয়ালা সামান্য ঠেলে কমলার সামনে এগিয়ে দিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

'এর নাম আধকাপ চা?' কমলা মিষ্টি করে হেসে কাটলেটের প্লেট আর ধোঁয়া-ওঠা চা ভর্তি কাপ দেখাল। 'আপনার বুঝি খুব খিদে পেয়েছে?'

'হ্যাঁ।' নিতাই তার প্লেটটা আরও একটু সামনে টেনে নিতে নিতে বলল, 'নিন্, শুরু করুন।'

কমলা ঘাড় সোজা করে খানিক তাকিয়ে থাকল নিতাইয়ের দিকে। একদৃষ্টে। তার ভাবনাটা এখন কেমন এলোমেলো মতন ঠেকল। কিছু একটা বলতে চাইছিল কমলা, মুখে কথা ফুটল না। শেষ পর্য্যন্ত প্লেট টেনে নিয়ে মাথা নিচু করে খেতে শুরু করল।

'আপনাদের ঘরের ব্যাপারে বাড়িঅলার সঙ্গে কথা হল।' নিতাই শব্দ করে ছুরি কাঁটা-চামচ রাখল প্লেটে। 'ব্যাটা যে

চামার সে-কথা জানতাম···’ মুখ নিচু করে চায়ের কাপে চুমুক দিল নিতাই। তারপর তাকাল কমলার দিকে। ‘আচ্ছা ও-ঘরটা ছেড়ে দিলে কি অসুবিধে হবে না আপনাদের ?’

‘হবে···’ বলে একটু থামল কমলা। পরিপূর্ণভাবে তাকাল নিতাইয়ের চোখে।···‘কিন্তু না-ছেড়েও পারা যাচ্ছে না।’ কমলার গলা এখন অত্যন্ত করুণ শোনাল। বুঝতে পারছিল নিজের কাছেই তার স্বর কেমন কাঁপা মতন লাগছে।

‘হ্যাঁ, সবই শুনেছি।’ সিগ্রেট ধরিয়ে মুখ উঁচু করে ছাদের দিকে ধোঁয়া ছাড়ল নিতাই। ‘আমি চেষ্টা করেছিলাম, করছিও···’ সিগ্রেটের মাথায় ছাই না জমা সত্ত্বেও ছাইদানীতে সে-টা ঝাড়ল নিতাই। ‘আমার কিছু ক্ষমতা নেই। প্রাইভেট কোম্পানীর চাকরী, আজ আছে কাল নেই। তবু যদি কিছু একটা করতে পারতাম···’ নিতাই বলে যাচ্ছিল কমলাকেই, কিন্তু একবারও তার চোখ ধরে রাখতে পারছিল না কমলার মুখের ওপর।

কমলা সেই যে মুখ তুলে তাকিয়েছিল, আর নামায়নি। খানিক আগে এ-মুখে উজ্জ্বল আভা জড়িয়েছিল। খুশীর, আনন্দের-- হয়ত বা অনাস্বাদিত এক সুখের। এখন সে-মুখে অল্প অল্প করে ছায়া জমতে জমতে ঈষৎ কালোর পোচ পড়েছে। জলভরা কাচের গ্লাশে ফোটা ফোটা করে কালো কালি মেশানোর মতন বদলে যাচ্ছে মুখের রঙ। নিতাই থেমে গেছে। এখন এক বিস্তৃত খাপছাড়া নীরবতা। যদিও কমলা মনপ্রাণ দিয়ে চাইছিল, নিতাই বন্ধ করুক এই কথা— আর না, আর না, আর না। দোহাই তোমার, তুমি বন্ধ কর। দিন রাত সর্বসময় ধরে কত দেখছি, শুনছি, পুড়ে পুড়ে শেষ হতে চলেছি সংসারের নিত্য অভাব অনটন দারিদ্র্যে, সেই

সংসারের কথা নাই বা শোনালে। তুমি জানো না, হয়ত বুঝবেও না আমার মনের কথা। বরং অন্য কথা বলো তুমি। আমার এই ক্ষণিক সুখের আনন্দ এমনি করে ভেঙে দিও না…এক মুহূর্ত তন্ময় হয়ে ভাবল কমলা। এই ছেদ, এই নীরবতা স্তব্ধতা পছন্দ হচ্ছিল না তার। এ-সময় অন্তত কিছু বলা দরকার। যে কোনো রকম কথা। কিন্তু কমলা ভেবে পাচ্ছিল না, কী বলবে। কোন কথা দিয়ে আবাব ফিরে যাওয়া যাবে আগের মুহূর্তে।

'পারু কিন্তু আপনার কথা প্রায়ই বলে।' কি বলবে, কি বলবে ভেবে আচমকা বলে ফেলল কমলা।

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ। অত লজেন্স টজেন্স খাওয়ালে বাধ্য না হয়ে পারে ? ছেলেমানুষ তো।'

'কি যে বলেন,' নিতাই এতক্ষণে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। 'অত আর কোথায় ? বড় জোর দিন তিনেক কি চার।'

'বাড়িতেও তো নিয়ে গিয়েছিলেন একদিন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বোন নাকি খুব আদর টাদর করেছে।'

'বোন !' বিস্ময়ের একটু ভাব ফুটতে ফুটতে তা সামলে নিল নিতাই। 'ও ঠিক আমার বোন নয়। ও-বাড়িও নয়… মানে ওবা আমার আত্মীয়ের মতন।' একটু থেমে গেল নিতাই। অল্প সময় কি ভাবল। 'আসলে ওদের আমি কেউ নই ··'

কমলার চোখে আরও ঘন হয়ে বিস্ময় জমল। যেন হঠাৎ তার মনে হল, নিঝুম রাত্রির নিঃসঙ্গ মন্থর প্রহরে তার মন নিতাইকে ছুঁতে চাইছে…

নয়

ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী যে কলরব আনন্দ উল্লাস নিয়ে এসে-ছিল, অষ্টমীতে তার রূপ আলোয় বাজনায়, মানুষের মনের খুশীতে হর্ষে পরিপূর্ণ হয়েছিল। অনেক রাত অবধি এই এলাকা জেগে ছিল অসংখ্য মানুষের আনাগোনায়, বাজনায় গানে-মুখর হয়ে। এক সময় তাও থামল। শেষ রাতের শুরু থেকে আবার এক বিষন্ন স্তব্ধতা—যেন রাখহরি দাস লেন সারাদিন অনলস অশ্রান্তভাবে নেচে গেয়ে সেজে হুল্লোড় করে গভীর শ্রান্তিতে নেতিয়ে পড়েছিল; সে-রাতও শেষ হয়ে সকালের সন্ধিতে আবার সে জেগেছে নতুন উদ্যম আর হর্ষ নিয়ে।

আজ নবমী। সকাল পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সূর্য এখন মাথার ওপর থেকে সামান্য হেলেছে পশ্চিমে। শরতের পুজো হেমন্তে এসে ঠেকেছে। সকালের দিকে কি রাত্রে শীতের ভাব যত বাড়ছে; তুপুরের রৌদ্রে উত্তাপের খরতা তত চড়ার দিকে। পাঁজির হিসেবের সঙ্গে ঋতুর কোনো যোগাযোগ নেই। আজকাল সবই কেমন ওলোট-পালট হয়ে যাচ্ছে। সারা বর্ষা হয়ত খটখটে গেল, ছিটেফোঁটা বৃষ্টির চিহ্ন নেই—হঠাৎ আশ্বিনের আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বৃষ্টি শুরু হল তো থামবার নাম নেই। তেমনি হেমন্তের তুপুরে যেন ভাদ্রের তালপাকা গরম।

রাখহরি দাস লেনের সতের নম্বর বাড়িতে এই পুজোর আনন্দ যেন আনন্দ নয়। বরং এক শোকের ছায়া নেমেছে। লতার কি এক রোগ হয়েছিল, দেখলে বোঝবার উপায় ছিল

না; শরীরে স্বাস্থ্যে রুক্ষভাবটাই যা প্রকাশ পেত। লতার মা বুক চাপড়ে কাঁদত, হা-হুতাশ করার মতন। শেষ পর্যন্ত সেই কান্না মরা-কান্নায় দাঁড়াল। এ-বাড়ির হাওয়ায় খুশীর একটু ভাব ফুটতে না ফুটতে কান্নার রূপ নিল। সকলেই প্রায় সন্দেহ করেছিল, কী এক খারাপ রোগ নাকি কোথা থেকে নিয়ে এসেছিল লতা; পচে-খসে মরার কথা—তার আগেই মরে গিয়ে বেঁচেছে।

গুপ্তদের বাড়ির পাশে খোলা মাঠে পুজো হচ্ছিল, তার ঢাকের আওয়াজ, খুশীর হল্লা মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, আবার যাচ্ছে না। লতার মা-র ডুকরানো কান্না থেকে থেকে সব শব্দকে ছাপিয়ে উঠছে।

সুষমার আশা ছিল, তার দিদি কয়েকটা টাকা অন্তত পাঠাবে। পারুল, নীহারকে সেই ভরসা দিয়ে রেখেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকা আর এল না। সুষমা তখন হতাশ বিষণ্ণ পরাজয়ের গ্লানিতে পুড়তে পুড়তে ভগবানকে ডেকেছে। ···ঈশ্বর ঈশ্বর, হে ভগবান নারায়ণ, পরম করুণাময়—রাত্রিতে এই ছোট অন্ধকার ঘরে সন্তর্পণে নীরব কান্না কেঁদেছে সুষমা। যেন তার আকুল অস্থির পরাজিত মন ভগবানকে ছুঁয়ে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছে। এক সময় এই আকুল ডাকও থেমেছে। অন্ধকারে ভগবানকে ভাবতে গিয়ে সুষমা ভেবেছে, আমি আত্মহত্যা করব। আর কি আশ্চর্য সঙ্গেসঙ্গে, মুহূর্তের মধ্যে অদ্ভুত এক সাময়িক দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। তার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ, রক্ত, মাংস, শিরা উপশিরা—স্নায়ুতে পর্যন্ত দপদপানি। আত্মহত্যা···আত্মহত্যা···মৃত্যু—সুষমা তার বুকের তলার স্পন্দনে এই কথা শুনতে পেয়েছে। এই ঘরের বদ্ধ অন্ধকারে ঘূর্ণি উঠেছে অকস্মাৎ; সেই ঘূর্ণিতে সাপের

মুখের শব্দ। চাপা অস্পষ্ট মিহি হিসহিসানি।...মৃত্যু—সেই ঘূর্ণি হঠাৎ আছড়ে পড়েছে সুষমার চোখে-মুখে।...আত্মহত্যা—তরল অন্ধকারে ঢেউ উঠেছে আচমকা। সুষমার মনে হয়েছে, তার চোখের তারা দু'টো হঠাৎ ফুলছে—ফুলে উঠছে ক্রমশঃ বেলুনে বাতাস ভরার মতন। তার চোখও...তার চোখের আকৃতি বাড়ছে বাড়ছে বাড়ছে—এই ছোট ঘরের অন্ধকাবে আর ধরে না...আমি মরব, সুষমা অনুভব করতে পেরেছে তার বুকের তলায় এক অসহায় ভীত, আর্ত শিশু কাঁদছে। সেই কান্না কেমন করে যে ছড়িয়ে পড়ল। সুষমা ধরতে পারল তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হঠাৎ কাঁদতে শুরু করেছে। কণ্ঠার কাছে বাষ্পাকারে জমেছে কান্না, চোখেও বন্যা নেমেছে—এই পৃথিবীর প্রতি এত মমতা আমার, ভাবতে গিয়ে ভয় পেয়েছে সুষমা। অন্ধকারের আকারে আচমকা যেন মৃত্যু লাফিয়ে পড়ল। সুষমার বুকের ভেতর ভয়ের সে কি ধুক্‌পুক্‌ শব্দ। ভয় পেয়ে সুষমা হাত বাড়িয়েছে অন্ধকারে। পারুল কি নীহারকে ছুঁয়েছে। বুকে হাত দিয়ে ওদের শরীরের স্পান্দনটুকু অনুভব করে বাঁচতে চেয়েছে। তার কান্না হঠাৎ শব্দিত হয়ে আবার থেমে গেছে।

....

এই পৃথিবী এখন কত ছোট। একসময় বিরাট বিশাল ছিল, এখন বেলুনের মতন চুপসে গিয়ে কত ছোট হয়েছে!

দু'টো ঘর ছিল। এখন এক। এই ঘরে পাঁচটি প্রাণী। কমলাপতির থাকবার ঘর এখন অন্যের অধিকারে। নতুন ভাড়াটে এসেছে। কমলাপতি এখন সুষমা ও মেয়েদের সঙ্গে এক ঘরে, এক বিছানায় শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছেন।

এই দিন শেষ হতে চায় না, ফুরোয় না। শীতের ভাব নামার সঙ্গে সঙ্গে আলোর আয়ু কমেছে; অন্ধকার বিশাল

বিরাট আকার নিয়েছে। ভাগ্যহত, দরিদ্র, সহায়-সম্পদহীন-মানুষের ভবিষ্যতের মতন এই রাত্রি। দিনের বেলায় সূর্যের উত্তাপ যেন ক্ষণিক সুখের মতন। এই ফুটল, এই হারিয়ে গেল।

কমলা স্নান করে এল এই অবেলায়। সুষমা এতক্ষণ দূরে দূরে ছিল, কি কথা যেন সুধবে—এখন পাশে এসে দাঁড়াল।

ভেজা শাড়ি নিঙড়াতে নিঙড়াতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কমলা। কিছু বলল না। শাড়ি নিঙড়ে উঠোনে টাঙানো তারে মেলে দিল। গামছা দিয়ে পেছনের চুলের গোছা ঝাড়ল। ধীর পায়ে উঠে এল বারান্দায়। নীহার চিঠি না কী লিখছে। কাগজ কলম নিয়ে মেঝের উপর ওপুড় হয়ে শুয়েছে ; বাঁ হাতটা তার বুকের তলায় চাপা। পায়ের দিকের শাড়ির খানিকটা ছেঁড়া। আরও ওপরে সেলাই করা খানিক অংশ। ঘরে ঢুকে কমলা নীহারের লেখা কাগজটার দিকে এক পলক তাকাল। পরে সরে এল দেওয়ালে টাঙানো আয়নার দিকে। পারুল কোণের দিকে ছেঁড়া কাগজ, নারকেলের মালা, ভাঙা মাটির হাঁড়ির টুকরো নিয়ে খেলছিল বুঝি—এখন সেই ছড়ানো ছিটনো জঞ্জালের মধ্যেই কাৎ হয়ে ঘুমিয়েছে। মেয়েটার গায়ে জামা নেই। মুখ ফ্যাকাশে, রুক্ষ, ক্ষুধার্ত। পেটটা প্রায় পিঠের সঙ্গে লাগার অবস্থা। কমলার চোখ খানিক আটকে রইল সেখানে। এতক্ষণ নবমী পূজোর ঢাকের বাজনা কানে শুনতে পাচ্ছিল, হঠাৎ সেই বাজনা থেমে গেল। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। চোখের ওপর পাতায় অন্ধকারের মত খানিক বেদনার ভার।

সুষমা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। কমলার চাউনি লক্ষ্য করে তার করুণ অসহায় চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

কান্নার ভাব চাপতে গিয়ে অদ্ভুত এক শব্দ বেরুল মুখ থেকে। বিমূঢ় কমলা সেই শব্দে যেন সামান্য চমকাল। মা, কমলা নীরব ভাষায় শুধু চোখ তুলে যেন ডাকল। তার চোখের নিচে ভয়ানক ক্লান্তির ছাপ এখনও। তার মধ্যেই কমলার নীরব অথচ মর্মান্তিক প্রশ্ন।

সুষমা কথা বলল না। তার মুখচোখ নিচু হল। পায়ের তলার মেঝে তার চোখকে টানল কী ভয়ানক আকর্ষণে···

'মা', কমলা আস্তে, অতি মিহি করুণ গলায় ডাকল আবার।

সুষমা তার ভারী আর্দ্র বিষণ্ণ চোখ তুলে তাকাল মেয়ের দিকে। না, সুষমা তার মাথা নাড়ল, আস্তে। বোকার মতন তাকিয়ে থাকল ফ্যালফ্যাল করে।

কমলার হাত থেকে চিরুনীটা খসে পড়ল মেঝেয়। অদ্ভুত বেখাপ্পা রকমের এক শব্দ উঠল। কমলার মনে হল তার হৃদপিণ্ড এতক্ষণ ধুকপুক করছিল ; এখন থেমে গিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। শরীরে রক্ত নেই, বরফ-গলা জলের মত হিম শীতল এক স্রোত তার শিরায় বইছে।

....

ষষ্ঠীর দিন থেকে বিছানা নিয়েছিলেন কমলাপতি। গায়ে ম্যাজমেজে জ্বর ; সর্দি-কাশির ভাবটাই বেশি। মুখ-চোখ ফুলো ফুলো। দু' চোখ টকটকে লাল। বেহুশ, আচ্ছন্নের মত দু'দিন পড়ে রইলেন বিছানায়। গতকাল সেই জ্বর ছেড়েছে। জ্ঞানহারা রুগীর প্রলাপ বকার মত কত কি বলেছেন, বুক থাপড়েছেন, কান্নায় ভেঙে পড়ে ভয়ানক আক্রোশে মাথার বালিশটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলতে চেয়েছেন। পাশে বসে সুষমা ধরে রাখতে পারছিল না ক্ষ্যাপা কমলাপতিকে। জ্বর তাপ রোগের যন্ত্রণার চাইতে

অক্ষমতার হা-হুতাশই বেশি ফুটছিল।…হায় হায়! কমলাপতি থেকে থেকে মর্মান্তিক, অতি ভয়ানক এক শব্দ করছিলেন মুখে।

জ্বরের ভাব কমে গেল। অষ্টমীর দিনই বেরুবেন—সুষমা বাধা দিল। 'এই বুড়ো বয়েসে কি কাণ্ডজ্ঞানটুকুও হারালে! পেটে দানা নেই—কোন সাহসে তুমি পথে বেরুবে।'

কিন্তু কার কথা কে শোনে। কমলাপতিকে কেমন পাগলাটে ভাবে ধরেছে। সুষমা যত বাধা দেয়—কমলাপতি তত চটেন। শেষ পর্যন্ত থেমে গিয়েছিলেন। কিন্তু আজ সকালে সেই কখন বেরিয়েছেন, এখনও ফিরছেন না।

সংসারে অভাব অনটন আছেই; আজ দু'দিন ঘরে কিছু নেই বললেই হয়। যা অবশিষ্ট ছিল, দু'মুঠো, গতকাল রুটি, খিচুড়ি করে চালিয়ে দিয়েছে। আজ সকাল থেকে দানা বাড়ন্ত। গতকালের দু'খানা রুটি সুষমা সরিয়ে রেখেছিল, আজ সকালে তাই খেয়েছে পারুল। তারপর আর হাঁড়ি চড়েনি।

....

কমলা চোখবুজে অন্য কিছু ভাববার চেষ্টা করছিল। সংসারের এই অভাব অনটন, নেই নেই, টাকাটাকা—অনাহার দারিদ্র্য থেকে তার মন মুক্তি চাইছিল। বুকের কাছে এখনও এক উত্তাপ লেগে রয়েছে; কমলা হাত দিয়ে বুক চাপল। নিতাইয়ের চিঠিটা এখনও আড়াল করে বুকে রেখেছে। এই স্পর্শ টুকু তাকে অদ্ভুত উত্তাপ এবং উত্তেজনা দিচ্ছে। চোখ বুজে কমলা এই চিঠির কথাগুলো স্মরণ করবার চেষ্টা করল। নড়ল সামান্য। আচমকা তার ঠোঁটের ওপর শিরশির এক অনুভূতি কাঁপল। সামান্য ফাঁক হল চোখের পাতা। ক্লান্ত, হতাশ, বিষন্ন চোখ বুললো কমলা চারপাশের সাদা

দেওয়ালে। ভাবতে চেষ্টা করল, সে এখানে নেই।' অন্য এক ঘরে সে একাকী। অপেক্ষায়। যেন নিতাই আসবে এখনই। ··আত্মীয় স্বজন বলতে কেউ নেই আমার। কেন জানি না কমলা, আমার বলতে মনে হয় একমাত্র তুমিই আছ। কি আশ্চর্য, কাল যখন তোমার হাত তুলে নিয়েছিলাম, আমার মনে হয়েছিল, এই স্পর্শ আমাকে সকল দুঃখ থেকে বাঁচাবে। তুমি কিছু মনে করো না, আবেগের মাথায় যা করেছি তার জন্য হয়ত আমাকে অপরাধীই ভাবছ—কিন্তু···

···কিন্তু আমি তোমাকে কি দিতে পারি। কমলা যেন নিতাইকে কিছু বলতে গিয়ে থামল। কষ্টের নিশ্বাস ফেলল। তার মন হালকা হাওয়ার মতন হয়ে আসছিল। সারা শরীরে অদ্ভুত এক অনুভূতি ; বুঝি সুখ। কেমন আকুলি বিকুলির ভাব—এই উত্তাপ উত্তেজনার জ্বালা মনোরম সুন্দর শোভন। কমলা যেন তার মন কোথাও ফেলে এসেছে। কোথায়! তার চেতনায় অনেক ছবি, টুকরো টুকরো অনেক ঘটনা। নিতাইয়ের সুন্দর হাসির ভঙ্গি, কোনো কোনো মিষ্টি কথা, তার আবেগের জড়ানো—কমলার বুকের ভেতর কনকন করে উঠল। চাপা আনন্দের মধ্যেও কষ্টের একটু ভাব ফুটল। হঠাৎ মনে হল কমলার, তার চোখের সামনে অনেক পথ—কোনোটা সোজা, সরল, সাপের মতন আঁকাবাঁকা কিছু, দড়ির মতন জড়ানো—এই অনেক পথের জটিলতার মুখে কমলা পথ চিনে নেবার আপ্রাণ চেষ্টায় রত অথচ পথ-ভোলার হতাশাও তার মধ্যে ততটাই।

দশ

পৃথিবীতে সুখ শান্তি বলে আর কিছু নেই। একদিন ছিল, যখন প্রায় সকলেই পেটভরে খেতে পেত, নিশ্চিন্তে দু'দণ্ড বসে গল্প-গুজব করত, আমোদ প্রমোদ আনন্দ-আহ্লাদ ছিল। সেই শান্তির দিন মানুষের ভাগ্য থেকে মুছে গেছে। হয়তো আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না। মাটির পৃথিবীতে শান্তির যুগ শেষ। আমরা বেঁচে আছি, সুখের দিনে সুখ করেছি ; এখন এক ছোট ঘরে পাঁচটি মানুষ এসে জড় হয়েছি। হাত-পা ছড়িয়ে গড়াগড়ি দেবার পর্যন্ত জায়গা নেই। পেটে ভাত পড়ছে না ; দু'দিন জুটল তো তিনদিন একবেলা খেয়ে কি উপোষ করে দিন কাটছে। এক পরিবারে আমরা একাত্ম হয়ে ছিলাম। মা-বাবা আর আমরা তিন বোন। আজ প্রত্যেকের যে সম্পর্ক, যত কাছের হোক, কিংবা রক্তের—তাও ভেঙেছে। ভেঙে ভেঙে এখন চরম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা আর পরস্পরের জন্য ভাবি না; নিজের সুখশান্তিই যেন বড়। আমরা স্বার্থপর হয়ে গেছি। অথচ কি আশ্চর্য, তখনও আমরা ছিলাম, আজও আছি—হয়তো আরও নিচে নামব তখনও আমরা বেঁচেই থাকব। দিন বদলের সঙ্গে যে অবস্থা, যে পরিস্থিতি আসবে তার সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে আমাদের। আমরা মানুষরা যেন সময়ের মতন সত্য। কমলার মনে মাঝে মাঝে এ-সব ভাবনা আসে। তখন অত্যন্ত উদাস মন পায় কমলা।

সতের নম্বর রাখহরি দাস লেনে নিত্য নতুন ঘটনা ঘটছে। ঝগড়া চেঁচামেচি ইতর গালাগাল বিনিময়—আরও কত কিছু।

দিন চারেক আগে রুমাবৌদির সঙ্গে ঝগড়া লেগেছিল সন্ধ্যার মা-র। সন্ধ্যার মা যা-তা কথা, অত্যন্ত কুৎসিত কদর্য ভাষা বলেছে। বেশ্যা বলে গালাগাল করেছিল রুমাকে, রুমা তার জবাব দিয়েছে। 'তোমার মেয়ে কোথাকার ধোয়া তুলসীপাতা শুনি? রাখাল সা-র কাছে মেয়ে বাঁধা রেখেছ আমরা জানি না?

'চুপ হারামজাদী, চুপ। তোর মুখে পোকা পড়বে। আমার মেয়েকে যা-র কাছে খুশি দেব, তোর তাতে কি? নিজের ইজ্জত আব ঢাকিস না। তোর বর সাজিয়ে গুজিয়ে তোকে রোজ সন্ধ্যায় কোথায় নিয়ে যায় লো? বারভাতারী করে পয়সা আনিস, ভাবিস কেউ জানে না, না?'

শেষকালে হাতাহাতি, কাপড় ধরে টানাটানি—কী ভয়ানক এক দৃশ্য। এমনি নিত্য নতুন ঘটনা সতের নম্বরে দিনের পর দিন ঘটছে।

সকালে নীহারের সঙ্গে কি কথা নিয়ে লেগেছিল আবার, সে সব থেমেথুমে গিয়েছিল দুপুরে আবার শুরু হয়েছে খানিক আগে। মা-ও লেগেছে নীহারের পক্ষে।

কমলা থামাতে চাইছিল। যতবার নীহারকে সরিয়ে নেবাব চেষ্টা করেছে—তত ক্ষেপে উঠেছে নীহার। মা-ও তেমনি; কথা শুনছে না। 'দোহাই তোমার, মা মা, তুমি সরে যাও।' কমলা সুষমাকে সরিয়ে নিতে চাইছিল, পারল না।

'কেন, কেন সরব?' সুষমা কমলাকে সরিয়ে দিয়েছে ধাক্কা দিয়ে। 'তুমি দেখবার কে? কে তোমার ধার ধারে এ-সংসারে। ধার দেনা করে কত কষ্টে সংসার চলছে আমি বুঝি…'

'চোপ্।' বাজ পড়ার মতন শব্দ করে কমলাপতি চেঁচিয়ে উঠলেন। 'আবার বললে….'

'কেন বলবে না?' অত্যন্ত কুৎসিতভাবে নীহার এগিয়ে গেল। 'বুড়ো বয়সে মা-র গায়ে হাত দিচ্ছ, ছিঃ ছিঃ তোমার লজ্জা করে না?'

'নীহার!' কমলাপতির গলা আবার ফেটে পড়ল। তার সর্বাঙ্গে দরদর করে ঘাম নামছে। গা-য়ের ছেড়া গেঞ্জি ভিজে সপসপে। একমুখ দাড়ি। চোখ লাল—জবাফুলের মতন। ভয়ানক বীভৎস দেখাচ্ছে কমলাপতিকে।...'আবার কথা বলবি তো থাবড়ে দাঁত খসিয়ে দেব, হারামজাদী।'

'কেন? তোমার খাই না পরি...'

'কী!' কমলাপতি খপ করে চুলের মুঠি চেপে ধরলেন নীহারের। 'যত বড় মুখ নয়...' পাগলের মতন এলোপাথাড়ি হাত চালালেন কমলাপতি।

বিশ্রী এক ধস্তাধস্তি। নীহার আচড়ে খামচে দিয়েছে বাবাকে। বাবার গা-য়ের গেঞ্জিটা ছিঁড়েখুড়ে ফালাফালা। বগলতলার খানিক ঝুলে পড়েছে। মা, বাবার হাত কামড়ে দিয়েছে। কমলা ধরতে গিয়েছিল—সরাতে গিয়ে তার অবস্থাও সঙ্গীন।

কমলা কাঁদছিল। কাঁদল—'এ তোমরা কি করছ—বাবা! ছোটলোকের মতন। নামতে নামতে এত নিচে তোমরা নেমেছ...! আমরা না ভদ্রলোক—তুমি না বড় চাকরী করতে বাবা—'

একসময় থামল এই কদর্য হাতাহাতি। বীভৎস ভয়ানক এক দৃশ্য, অবিশ্বাস্য রকমের কুৎসিৎ খেয়োখেয়ি, কামড়াকামড়ি—মা-য়ে ঝিয়ে বাবায় মারামারি। কমলা খানিক কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তার মনে হচ্ছিল, সে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নই। এ হতে পারে না, কিছুতেই নয়।

সুষমা সরে গিয়ে হাঁটুমুড়ে বসে কোলের অন্ধকারে মুখ

আড়াল করেছে। পারুল তার পিঠঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে কাঁদছে। নীহার ফুলছে। তার চুলগুলো আলুথালু, চোখ ছু'টো লাল। ভয়ানক লাল। রক্তের মতন। যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে নীহারের চোখ। গাল গলা কাঁধ থেকে দরদর করে ঘামের বন্যা নামছে। পরনের কাপড়-চোপড় ঠিক নেই। ময়লা নোংরা ছেঁড়া তালিমারা শাড়ির গোটাআঁচলের দিকটা মেঝেতে লুটোচ্ছে। নীহারের বুক পিঠ গা সব উদোম আলগা নিরাবরণ। রাগে ছুঃখে ক্ষোভে কাঁদছে নীহার। ফুলছে। কী ভয়ানক কুৎসিৎ দেখাচ্ছে—যেন কোনো মার-খাওয়া জন্তু জানোয়ার কিংবা ক্ষ্যাপা পাগলা কুকুরের মতন। হাঁসফাঁস করে নিশ্বাস নিচ্ছে নীহার। তার ভঙ্গিটুকু পর্যন্ত কদর্য।...'কেন, কেন আঁতুড়ে মুখে নূন দিয়ে কি গলা টিপে মেরে ফেলনি, কেন জন্ম দিয়েছিলে আমাদের, কেন কেন?'

এই ছোট ঘরে কান্না আর ধরছে না। সুষমা কোলের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। পারুলের চোখের কোল গড়িয়ে গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। কমলাপতি খানিক স্তব্ধ কাঠ হয়ে ছিলেন, এখন দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। থেকে থেকে হেঁচকি তুলে কান্নার মতন মৃত্যু কাঁপন উঠছে তার দেহে। নীহার মেঝের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে উঠল জোরে। যেন তার কথা এখনও ভাসছে এই ছোট ঘরের মধ্যে—কেন, কেন জন্ম দিয়েছিলে আমাদের...

মা আর বাবা চোখবন্ধ অন্ধকারে বুঝি সেই প্রশ্ন খুঁজে মরছিল। কিংবা অন্ধকারে ভগবানের মূর্তি কল্পনা করে ভাবছিল সেই কথা? কেন জন্ম দিয়েছে আমাদের, কেন? কেন জন্মের সময় মুখে নূন দিয়ে কি গলা টিপে

মেরে ফেলনি আমাদের, সেই প্রশ্ন মা-বাবাকে যেন অন্ধ করছে।

কমলাও কাঁদছে। তার খুব খারাপ লাগছিল এই দৃশ্য। অভাবে দারিদ্র্যে এত যাতনা—এত কান্না। কমলার মনে হচ্ছিল—এই বাঁচা, বেঁচে থাকা, মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক। ভয়াবহ। অথচ এরই ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে আমরা কোথায় নামছি—কত নীচে—পাতালে না নরকে—এ-নামার যেন শেষ নেই···

বিশ্রী কুৎসিৎ কদর্য এক ভয় আচমকা কমলার মনে লাফিয়ে পড়ল।

এ-ঘরে আজ খাওয়া-দাওয়ার পাট নেই। সেই বিকেল থেকে যে গুমোট ভাব ধরেছিল, তাই থাকল। বিকেল গিয়ে সন্ধ্যা নামল। আলো জ্বালল না কেউ। কমলা বারান্দায় বসে আছে তো আছেই—ওঠেনি। ঘরে সুষমা। পারুলকে ডেকে নিয়ে গেছে রুমা। নীহার কোথায়—কে জানে। কেমন যেন সব এলোমেলো খাপছাড়া হয়ে গেছে গোটা বাড়ির চেহারা।

দশটার ঘণ্টা বাজলে কমলা উঠেছিল। আলো জ্বালিয়ে বিছানা-টিছানা করল। তারপর শোবার পালা। ছোট বড় দু'টো মশারী পড়েছে পাশাপাশি—ময়লা বিবর্ণ তেলচিটে বিছানা—ছোট বিছানা কমলাপতির, বড়টায় মা-মেয়েরা মিলে চারজন।

ঝগড়াঝাটি করে কমলাপতি বেরিয়ে গেছেন। ফিরবেন হয়তো অনেক রাতে; যখন এ-বাড়ির প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়বে। ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে নিঃশব্দে বিছানা নেবেন। রুমার ঘর থেকে পারুলকে নিয়ে এল কমলা।

সুষমা উঠে গিয়ে বারান্দায় বসেছিল, তাকে বিছানায় আনতে আবার এক ঝামেলা। এই এত রাতে নীহার স্নান করে এল কুয়ার জলে। সব কিছু নীরবে নিঃশব্দে হয়ে যাচ্ছে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। যেন সকলেই বোবা।

চটকলের ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং ঢং···কমলা কান পেতে রইল। প্রত্যেকটি শব্দ গুণল এক এক করে। রাত এখন বারোটা। ঘর নিস্তব্ধ। খানিক আগেও সুষমার দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল কমলা। নিশ্বাসেরও একটা ছন্দ আছে—তার টানা এবং ছাড়ার মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে কিন্তু সুষমার নিশ্বাস পড়ছিল অত্যন্ত বেখাপ্পা ছন্দহীন ভাবে। হয় মা ঘুমোয় নি কিংবা ঘুমের ঘোরে কাঁদছিল। এখন সে শব্দ থেমে গেছে। শুধুই নিস্তব্ধতা এখন। কালো জমাট অন্ধকার এই ঘরে। চোখ মেললেও দেখা যায় না কিছু। চোখ খুলে ছিল কমলা—তবু তার মনে হচ্ছিল সে চোখ বুজে আছে। কানের কাছের শিরা দু'টো দপদপ করছে, বুকের তলায় হৃদপিণ্ডের স্পন্দন—একটা ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে পরিত্রাহি—সেই শব্দটা কাছে ছিল এতক্ষণ, এখন মনে হচ্ছে অনেক দূরে। কমলার চোখে ঘুম নেই। মাথার ভেতরের শূন্য শূন্য ভাবের মধ্যেও উত্তাপ, ভূরুর তলায় সামান্য ব্যথা, চোখে অল্প জ্বালার ভাব। উষ্ণ জলের স্রোত মাঝে মাঝে তার চোখকে ভিজিয়ে দিচ্ছে—কমলার চোখে ঘুম নেই।···এই ছোট সঙ্কীর্ণ ঘরের অন্ধকার—কী কালো! কালির চাইতে ঘন, চুলের রঙের চাইতেও গাঢ়, অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকার, চোখ বুজলেও তার রঙ এত ভয়ানক নয়—কমলার চোখে ঘুম নেই ··ঘুম নেই—কমলা ঈশ্বরকে স্মরণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। তখন সনতের মুখ ভেসেছে

তার চোখে। ঈশ্বর কি সনৎদার মত নির্দয়, নির্মম গুণ্ডা কি বদমাশ কিংবা অপদার্থ···

কমলা ভাবল আমি মরব। কিন্তু কেমন করে, কী দিয়ে? ···আমরা যদি সকলেই মরে যাই। মরতেও পারি। মরা আব এমন কি কঠিন কাজ! তু' চার তোলা আফিং খেলেই হল কিংবা গলায় দড়ি দিয়ে···দড়ি দিয়ে···গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে—ফাঁসী দিলে মানুষ কেমন করে ঝোলে কমলার দেখতে ইচ্ছা হয়। এ-পাড়ায় কে যেন তেমনি, ঠিক তেমনি ·· পায়খানায় ঢুকে কাপড়-চোপড়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়েও···আমি যদি মরি—মরলে কি মানুষের কাছে সবই অন্ধকার···সে-অন্ধকার কেমন—মৃত্যুর কথা ভাবতে গিয়ে ভগবানের কথা মনে পড়ল কমলার···মরলে মানুষ ভূত হয় কি সত্যি···কোনটা ঈশ্বর? নারায়ণ, মহাদেব, তুর্গা কি কালী ···মৃত্যু···মৃত্যু—কমলার মনে হল জন্মের নাম মৃত্যুর নাম বাবা! কি আশ্চর্য কমলা ভাবল পিসিমা মরেছে! কেন মরেছে, কবে? কেমন করে যেন দিনে দিনে পিসিমা মরে গেছে। গেছেই। বাবা যদি মরে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তার চাইতে আমি, আমিই···আরও পরে কমলার মনে হল সে নীহার। নীহার নামের আমি মারা গেছি। আকাশ যেমন করে মেঘলাটে হয়ে আসে, এক টুকরো কালো মেঘ যেমন করে ছড়ায়—ছড়াতে ছড়াতে সারা আকাশ ভরে, কালো ছায়া গাঢ় হয়, বিত্যুৎ চমকায়—তার ক্ষণিক জেগে ওঠা রেখাগুলো কী ভয়ানক আঁকাবাঁকা···আমি রুমাবৌদির মত হলে, সন্ধ্যার মত রাখা মেয়েছেলে হলে কিংবা লতা বলেছিল · তাই করব। ওয়েলেসলীতে ম্যাসাজ ক্লিনিকের চাকরী।···সুখই চেয়েছিলাম কমলাদি, কিন্তু ভদ্দরলোক হয়ে বাঁচার পথ পাইনি। দেশ সমাজ সকলের কাছে আমি মরেছি। কিন্তু

বেঁচে কিছু না পাওয়ার চাইতে, মরে পেয়েছি অনেক। পেট ভরছে দু'বেলা। মনও। দু'দশটাকা এখন সখের জন্য খরচ করতে পারছি · লতা মরেছে; কমলার মনে হল সেও মরেছে। মরে অন্ধকার। অন্ধকারে কমলা পথ হাতড়ে মরছে ··এত পথ···কত····কোন পথে, কোন পথে, কোন পথে আমি যাব, বাবা····কমলা মা-র মুখ ভাবতে চেষ্টা করল—কি আশ্চর্য মা মনে পড়ছে, তার ছবি নেই। চোখে ভাসে না··· মা মা মা—কমলা মুখ বুজে ডাকল। পিসিমা, নীহার, সন্ধ্যার মা, রুমাবৌদি কত মানুষ চোখে এল, মা এল না। আরও পরে শুধু নিতাই।···ইস্ নিতাইরে—কী নাম, নিতাই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ··তোমার নামটা বাপু পালটাও তো। ও-নাম আমার অপছন্দ···তার চেয়ে সুধাময়, বাসু, তীর্থপতি··· না না তীর্থপতি না, শ্যামবাজারে থাকতে একটা কি বই যেন পড়েছিলাম···কিসের আয়ু! ঈশ্বরের···মানুষের—না বাপু ও নাম ছাই মনে নেই—শুধু তিতুব কথা মনে আছে। তিতু আর বকু। ভালবাসা—শেষকালে মিলন হল না। তিতু ·· জানো, আমাদের একটা আলমারী কিনতে হবে। বই রাখব।···ইস্ তুমি যে কি কর! অত দুষ্টুমি করলে কিন্তু ···আচ্ছা সংসারে তোমার তো কেউ নেই, না? আমি যদি মরি, তুমি কি···তুমি কি···তুমি···

স্বপ্ন দেখল কমলা:

··এই পথ ধরে কমলা আসছে। শহরের বড় বড় রাস্তা, বিরাট বিশাল বাড়ির সারি ছাড়িয়ে, ছোট খালের পুল পেরিয়ে, তারপরও বাঁয়ে। পথ এখানে অল্প ছোট; কাঁচা নয়, পাকাও না—কতকাল আগের পাতা ইট, ঘষায় ঘষায়, রৌদ্রে জলে ধুয়ে এবড়ো-খেবড়ো অবন্ধুর। গেরুয়া রঙের ধুলোর সঙ্গে মাটিও মিশেছে। এখন তার রঙ আরও ফিকে

—তাতে সোঁদা মাটির মতন গন্ধ। পেছনের পথে শুধু বাড়ি। গাছ পালা নেই। সারি সারি আলোর থাম ছিল। এখন একটা দু'টো গাছ পড়ছে। উঁচু পুলের ওপর দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হয়, এই পথের প্রস্থ ক্রমশ কমেছে। কমতে কমতে আরও চেপে, অনেক দূরে গিয়ে দড়ির মতন সরু সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। তারপর আর নেই।···কমলা আসছে এই পথে। তার গাড়ি টানছে দু'টি গরু। গ্রীষ্মের চড়া রোদে পথ জ্বলছে। জল ফোটানো বর্ণহীন ধোঁয়ার মতন পথ থেকে এক ধরনের বাষ্প উঠছে। গরু দু'টি শীর্ণকায়, জিরজিরে হাড় তাদের যেন গোনা যাচ্ছে। কাঁধে দগদগে ঘা—গুটিকয় মাছি সেই কদর্য কুৎসিৎ ঘা-য়ের লোভে চক্কর খেয়ে উড়ছে। ওরা যাবে—যতদূর এই ঘা নিয়ে চলবে গরুগুলি। সেই ঘা-য়ের ওপর জোয়াল চেপে বসেছে। নিচু পথে ওরা লেজ তুলছে, উঁচু পথে কাৎরে কাৎরে—যেন টানতে পারছে না গাড়ি। গাড়োয়ান মারছে—দু'টি গরুর লেজ ধরে মুচড়ে দিচ্ছে জোরে। কমলা জানে না সে কোথায় যাবে! অথচ তার যাওয়ার কথা—তাকে যেতে হবে। কোথায় ?······

···গাড়ি যাচ্ছে যাচ্ছে, দূর থেকে দেখা সরু পথ আরও দূরে, সামনে সরে যাচ্ছে। এখন গাছ-গাছালির ভিড়, বেতসের কুঞ্জ, ফণীমনসার ঝাড়, বাতাসে দোল খাওয়া ধানের ক্ষেত, তেঁতুল বটের ছায়া—বনতুলসীর ঝোপ ; পথ তবু দূরে এগিয়ে গেছে।

···বেলা পড়ে এসেছে কখন, পথের শেষ নেই। পথ এগিয়ে গেছে। কমলার গাড়ি থামল। কমলা নামল। ছোট জলার পাশ দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। দীর্ঘ ঘাস, তেলাকুঁচ লতার জটিলতা, ধুতুরা গাছের দু'টি ফুল আকাশের দিকে

মুখ তুলেছে, লেবু ফুলের মিষ্টি গন্ধ আসছে, জলার পাড় ঘেঁষে কলমীলতার ঘন সন্নিবেশ, বেগনে রঙের একটি দু'টি ফুল, শশার মাচানে পুচ্ছ নাচিয়ে একটা দোয়েল ডাকছে···

সুতরাং এই সময় তখন, যখন কমলা পেয়ারা তলায় এসে থামল। এই সেই চেনা জায়গা—দু'টো পায়ে চলা পথ মিশেছে এখানে। এবং কমলা দাঁড়িয়ে দেখল, বুঝল—সময়, সময় এখানে আগুনের তাপে ঝলসে যাচ্ছে।

···ডাইনের পথ ধরল কমলা। তার হাতের মুঠোয় ঠিকানা ছিল, আগুনের তাপে ঝলসানো সময়ের চিতায় সেই ঠিকানার চিরকুট ফেলে এসেছে। এখানে অনেক ঘর, পর পর, সারি সারি, এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়ার পথ অন্ধকার। কমলা আলো জ্বালল। এক দীর্ঘ বারান্দা—ঘরের চাইতেও যেন অনেক বড়, বিরাট উঁচু ছাদ, নিরানন্দ, শূন্য শূন্য ঝক-ঝকে এবং ঠাণ্ডা। ছোট এক দরজা; একদিন আগুন লেগেছিল, পাল্‌লা পুড়ে কয়লার রঙ ধরেছে। কোণের দিকে জলের কুঁজো। কমলা দরজার দিকে এগুল। দরজার কাঠের ফলকে লেখা ছিল। উপকণ্ঠ: আগুনে সে-অক্ষর পুড়ে গিয়ে ঝাপসা হয়েছে। ভয়ঙ্কর, অকারণ ভয় জাগল তার মনে, অবশ অসাড় তীব্র ভীতি তার বিশ্বাসকে ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে···

···এক বুড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে। সে মাথা নিচু করল, মাথা নাড়ল। তার গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে, সে কি যেন বলল বিড়বিড় করে। কমলা বুঝল, এই ঘরে তার দেহ আছে। মৃত দেহ। বিবেক, বুদ্ধি, শ্রমের মর্যাদা, সং প্রবৃত্তি নিয়ে খণ্ডিত এক দেহ এই ঘরে মরেছে কয়েক যুগ

আগে···সেই গরুর গাড়ি চড়ে কমলাকে যেতে হবে আরও দূরে···

ঘুম ভাঙ্গল কান্নার শব্দে। কমলা বিস্রস্ত অবিন্যস্ত বেশে ছুটে এল, নীহার ঝুলছে কুয়োপাড়ের কাঁঠালগাছেব ডালে।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

'ওষুধটা খেয়ে নাও।'

'না।'

'না কেন? এ-সব পাগলামি আমার ভাল লাগে না।'

'না লাগে, ফেলে দাও।'

'ফেলে দেবার জন্যে কি এতক্ষণ খাটলাম?' কমলা আরও একটু সরে এসে তক্তপোষে বসল পা ঝুলিয়ে। 'শোনো, কথা শোনো আমার'… ..বাঁ-হাতটা নিতাইয়ের বুকে রাখতে গিয়েছিল কমলা, সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে শুল নিতাই। কমলার দিকে পেছন দিয়ে।

'ইস্, কী রাগই না করতে পার, বাব্বা!' ওষুধ ভরতি কাচের গ্লাসটা তক্তপোষের কোনার দিকে রেখে, ঝোলানো পা দু'টো তুলে আরও ঘন হয়ে বসল কমলা, 'পায়ে ধরতে হবে নাকি বাবুর?'

নিতাই চুপ।

'এই', নিতাইয়ের কাঁধ ধরে আস্তে টানল কমলা, 'আচ্ছা বাপু আচ্ছা, ওষুধ না হয় নাই খেলে, একটা কথা শোনো।'

'বলো।'

'বাঃ রে, মুখোমুখি না হলে কী করে বলি?'

'অল্প চিৎ হবার ভঙ্গি করে আড়চোখে তাকাল নিতাই, এক পলক। কমলার মুখের হাসির ভাবটা দেখে নিল। তারপর আরও একটু নড়ে সোজা হয়ে শুল।

কাচের গ্লাসটা এখনও রয়েছে তক্তপোষের কোনায়। তাতে চায়ের শুধু লিকারের রঙের মতন তরল ওষুধ। একটুও

খায়নি ; এবার খেতেই হবে। না খাইয়ে ছাড়বে না কমলা। তার আগে এই আদুরে কথা, সোহাগের ভাব সবই ওই জন্য। স্ত্রীর এই সাধাসাধি, আদর করার ভঙ্গি দেখে মনে মনে কৌতুক অনুভব করছে নিতাই। আজ দু'বেলাই এই পাচন গিলতে হয়েছে। অবাধ্যের মতন করেনি। এখন একটু জেদি ভাব ধরেছে।···

—'বলো।' নিতাই ছাদে চোখ রাখল।

'না, বলব না আমি।' কমলা অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে, মাথাটা নামিয়ে আনল নিতাইয়ের বুকের কাছে, 'এমনি করে কথা হয় নাকি ?'

'কেমন করে ?'

'তুমি ছাদে তাকিয়ে থাকবে আর আমি···'

নিতাই চোখ নামাল ছাদ থেকে, মাথাটা সামান্য কাৎ করে কমলার দিকে তাকাল, 'এবার হলো ?'

'হ্যাঁ।'

কমলার চিবুক নিতাইয়ের বুক ছুঁয়েছে। চোখে চোখ পড়েছে। নিতাই তার মুখের জেদি এবং গাম্ভীর্যের ভাবটা জোর করে রেখে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কমলাকে। কারও মুখে আর কথা নেই।

'কি যে বলবে বলছিলে ?' নিতাই নিস্তব্ধতা ভাঙল খানিক বাদে।

সামান্য একটু নড়ল কমলা ; তার মাথাটা কান চাপা অবস্থায় নিতাইয়ের বুকের ওপর ছিল, বুকের ভেতরের অদ্ভুত এবং জটিল কিছু শব্দ শুনতে পাচ্ছিল কমলা, এখন সে শব্দটুকু বন্ধ হয়ে গেল যেন মাথা সরাবার সঙ্গে সঙ্গে। মুখ তুলে আবার নিতাইয়ের চোখে চোখ রাখল কমলা।···'তুমিই বলো।'

'বাঃ, বেশ কথা তো! নিজে বলবে বললে…' নিতাই ঠোঁটে হাসল অল্প করে। এতক্ষণ তার হাত কমলার মাথায় আস্তে ঘুরছিল, খুব নরম করে বুলানোর মতন,—এখন মুখটা আরো কাছে সরে আসতে, সিঁথির দু'পাশের ছোট খুচরো চুলগুলো নিয়ে খেলতে লাগল। এবং অনুভব করতে পারল তার মনের জেদ, গাম্ভীর্যের ভাব কোনোটাই আর নেই।

দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বিকেলের শেষ উজ্জ্বল আলোটুকু মাথার পাশের ছোট জানলা দিয়ে বিছানায় এসে পড়েছে। ঘরময় এখনও আলোটে ভাব। সামান্য মলিনতা মিশেছে যদিও কিন্তু আলোর ভাবটাই বেশি।

আঁকা ছবিতে তুলি বোলানোর মতন নিতাই তার আঙুল কমলার ভুরুর ওপর বার কয়েক চালাল, নাকে বুললো, গালে ঘষল, ঠোঁট টিপে দিয়ে চিবুকের তলায় নামাল। যেন সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কমলার রূপ দেখছে। বিয়ের এতদিন পরেও। নিতাইয়ের মনের মধ্যে এখন এক সুখ, অনেক আনন্দ জমছে। এই মুখ, কমলার আবেগ জড়ানো অল্প খুশীর রঙে উজ্জ্বল মুখের ভঙ্গি, অল্প চাপা ছোটমতন চিবুক, সুডৌল; নিচের ওষ্ঠ আর চিবুকের মধ্যে ধনুকের মতন বাঁকা এক সুন্দর ভাঁজ। হালকা দু'টি ঠোঁট মোলায়েম মসৃণ। সামান্য লাল রঙ যেন মিশে গিয়ে তার সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। কমলার অল্প ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটের মধ্যের ভাঁজটুকু পর্যন্ত দূর আকাশে ডানা-মেলা পাখির রেখার মতন। তার নাকের তলায়, ঠোঁটের ওপরে সামান্য ঢালু মতন এক প্রশস্ত রেখা। ভুরুর সন্ধি থেকে খানিক চাপা, আরও নেমে এসে, সামান্য স্ফীত হয়েছে নাক। তলা থেকে দু'টি সূক্ষ্ম ভাঁজ পাটার দু' পাশে বৃত্ত সৃষ্টি করতে করতে নাকের ডগায় এসে থেমে গেছে। দু'টি গাল আগে ফোলা মতন ছিল, এখন ভেঙে ভেঙে,

সামান্য চাপা হয়ে যেন মুখের শ্রী বাড়িয়েছে। আয়ত ঢলঢলে চোখে স্বপ্নের মতন এক রঙ, চোখের তারায় আকাশের ছায়া। পুরু গভীর কালো ভুরু। তার নিচে, পাতার ওপরে, মোছা কালির রেখার মতন অস্পষ্ট ধূসর এক সূক্ষ্ম টানা দাগ। সিঁথির পাশ থেকে ক-টি খুচরো চুল এলোমেলো নেমেছে মসৃণ কপাল বেয়ে, সুষম বঙ্কিম ভুরু ছুঁয়ে, আয়ত গভীর চোখ ডিঙিয়ে। নিতাই দেখছিল, শেষ বিকেলের মলিন আলোয় কমলার চোখের নিচে ছোট ছায়া। অল্প কালো। তার চোখের তারায় অবসন্নতা, সারা মুখে শ্রান্তির ভাব।

'কমলা', আস্তে, খুব নরম আবেগ জড়ানো গলায় ডাকল নিতাই। আরও কাছে টানল তার মুখ, নাকে ঠেকল গাল, 'তুমি যে ওষুধ এনেছিলে…'

'হুঁ।' ঠোঁট না খুলেও সুন্দর শব্দ করল কমলা।

আরও খানিক সময় পার হল। শেষ-বিকেলের যে-টুকু আলো জানলা দিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছিল এই ছোট ঘরে, তারও যাই যাই ভাব। ঘরের কোণের দিকে, আলনায় সাজানো অল্প ক-টি কাপড়-জামার পেছনে, খাটের তলার দিকে, জানলার নীচে হালকা, সামান্য ঘন হয়ে আসা ছায়ার মতন ওৎপাতা অন্ধকার। এবং এই অন্ধকার যেন যে কোনো মুহূর্তে লাফিয়ে পড়বে। আচমকা। বাতাস নড়ছে এই ছোট ঘরের সময়ে। গুটনো মশারীর ঝুলে পড়া প্রান্ত দুলছে, ক্যালেণ্ডারের ছবিতে ফুলফোটা গাছের ডালে বসা একটি পাখি। তার সমস্ত শরীরের ফিকে নীল রঙের তলায় বুকের সাদা অংশ যেন নড়ছে। অল্প অল্প কাঁপছে ক্যালেণ্ডার।

এক সময় মুখ তুলল কমলা। যেন দরজা-বন্ধ এক সুখের ঘরে নিশ্চুপে তার সময় কাটছিল, সুন্দর নিবিড় এক

অনুভব তাকে সেই সুখের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল, কমলার মন সেই সুখের তলা ছুঁয়ে কত সময় ধরে চুপচাপ থাকল, তারপর তার শরীর মন হালকা হতে হতে জলের চাইতেও লঘু হয়ে গেল। কমলা ভাসল। সে উঠতে লাগল। এখন অন্য এক আলোয় এসে সে পৌঁছেছে। শেষ-বিকেলের সেই বিষণ্ণ আলো এসে মাখামাখি হয়ে গেল। মুখে, গালে, গলায়। কমলা তার এলোমেলো কালো চুল, কপাল, চোখ, গালের ওপর থেকে সরাল। সরিয়ে আলো দেখল। ইস্, সন্ধ্যা যে হয়ে এল! কমলা যেন রাত্রির ঘুম ভেঙে সকাল দেখে চমকে উঠেছে—তেমনি করে তাকাল বিস্ময়ের সঙ্গে।

মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়া অবিন্যস্ত চুল সরিয়ে আলোর দিকে তাকিয়ে কি ভাবল কমলা। তাকাল নিতাইয়ের চোখে। নিতাই কথা-না-বলা মুখে নীরব অথচ শান্ত সুন্দর হাসি হাসল।

'ইস্, একটু ওষুধ খাওয়ার নামে…' কমলা আঁচল গুছিয়ে উঠে বসছিল।

'খাবো।' নিতাই আবার হাসল।

'খাবে তা জানি। কখন খাওয়ার কথা। এতক্ষণ তা হ'লে অমন করছিলে কেন?'

'তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে! কেন, আমি তোমার কি করলাম আবার?'

'ওষুধ এনেছিলে যে।'

জোরে হাসবার চেষ্টা করল কমলা, 'দিন দিন কচি খোকার মতন হচ্ছ। শুধু আব্দার। কেন বাপু, ওষুধটা খেলে আমার অসুখ সারবে, না তোমার?'

'আমার।'

'তবে ?'

ফুরুৎ করে একটা চড়ুই পাখি উড়ে গেল জানলা দিয়ে। নিতাই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে গিয়েও দেখতে পেল না। চড়ুই নেই। বিকেলের শেষ আলোটুকু জানলার খোলা পাল্লায় লেপটে রয়েছে। পুরনো, মরচে-ধরা শিক জড়িয়ে খানিক বিছানায় লুটোচ্ছে। বাইরে সামান্য দূরে ছোট টালির চালের খানিক অংশ চোখে পড়ছে। তা ছাড়িয়ে একটা কুলগাছের মাথা। তার ছোট সরু পাতা বাতাসে কাঁপছে। এই সুন্দর সবুজ পাতা ভাল লাগল নিতাইয়ের। খুব ভাল। যেন তার অসুস্থ শরীর এবং মনে সবুজের রঙ লাগল। নিতাই ভাবত, সে বাঁচবে না। কেন যে মনে হয় জানে না। এখন হঠাৎ তার মন যেন বাঁচার গন্ধ পেল···

'তোমার ওষুধ।'

ওষুধ! নিতাই যেন ভুলে গিয়েছিল ওষুধ খাওয়ার কথা, খানিক আগের এক সুখ এবং এখনকার বেঁচে ওঠার স্বপ্ন তাকে দূরে কোথাও নিয়ে যাচ্ছিল, কমলা পথ আগলে দাঁড়াল। সে যেতে দেবে না। কমলা ডাকছে। টানছে। নিতাই চমকাল না, অথচ তার ভাবনা থেকেও সরে আসতে পারছিল না সে।

'শুনছ? এই, ওষুধটা খেয়ে নাও এ-বার। সন্ধ্যে হয়ে এল···'

কোনো কথা না বলে পাশ ফিরল নিতাই। কনুইয়ে ভর করে মাথাটা তুলল সামান্য। হাত বাড়িয়ে গ্লাস নিল। এক চুমুকে বিস্বাদ পাচনটুকু শেষ করে আবার শুল। হাসল। 'আচ্ছা, কতদিন আর এই পাচন গিলতে হবে বলতো?'

কমলা চলে যাচ্ছিল, নিতাই তার শাড়ির এক অংশ ধরে ফেলল।

'আবার কি হচ্ছে…'

'এসো না।'

'এতক্ষণ তো ছিলাম।'

'আর একটু না হয় বসলেই।'

'ইস্, কী যে কর না তুমি! আর লোকের যেন বউ হয় না …তোমার হয়েছে।' কমলা বিরক্ত এবং অখুশীর ভান করল।

'আমার কথার জবাব দিলে না তো?'

'কী কথা আবার…?'

'কবে আমি ভাল হব।'

'অসুখ সারলেই।' জোর গলায় হেসে ফেলল কমলা, 'এমন ছেলেমানুষের মতন কথা বলতে পার…কবে অসুখ সারবে, কেউ কি বলতে পারে নাকি?'

'পারে।'

'পারে তো পারে, আমি বাপু ডাক্তার কোবরেজ নই।'

কথা বলতে বলতে কমলা একটা পা তুলে তক্তপোষের ওপর বসেছিল, নিতাই কাৎ হয়ে তার বাঁ-হাতটা কমলার কোলের ওপর রাখল; চোখ কমলার মুখে। মাথাটা আরও সরিয়ে আনল। 'তোমাকে কত কষ্ট আর দেব? সেই যে পড়লাম, আমার আর…' নিতাই বলতে চাইছিল, আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না তার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না বলে থেমে গেল।…'না, কিছুই ভাল লাগে না কমলা।'

'আমাকেও না?' অল্প ঝুঁকে পড়ে নিতাইয়ের বুক ছুঁল কমলা। হাসল।

বাইরে অনেক মানুষের কলরব। এতক্ষণ শব্দটা অল্প ছিল, হঠাৎ বাড়ল এখন। ঝগড়া লেগেছে। কে যেন মুখ খুলেছে, তার চড়া গলার স্বর এ-ঘরে পর্যন্ত পৌঁছেছে।

কলে জল এসেছে অনেকক্ষণ। হাঁড়ি কলসী বালতির লাইন পড়েছে। কমলার মনে পড়ল তার ঘরে খাওয়ার জলটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ।

ভেজানো দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল কমলা। কুলগাছের পাতার জাফরির ফাঁক দিয়ে যে-টুকু আকাশ দেখা যায়; দেখল। কি ভেবে উঠোনে নেমে এল। মাথার ওপর এখন অনেকটা আকাশ। অনেক বড়। এত বড়··· অনেক ওপরে এক ঝাঁক পাখি দলবেঁধে উড়ে যাচ্ছে। দু' চার টুকরো হালকা, ছোট সাদা মেঘ দক্ষিণের দিকে স্থির হয়ে রয়েছে। যেন নীলাম্বরী শাড়ির গায়ে কোনো দুষ্টু ছেলে, আঠা মাখিয়ে ক-টুকরো কাগজ এঁটে দিয়েছিল, খেলায় খেলায় মেতে সে ভুলে গেছে তার কাগজের কথা।

'এই বুঝি ঘুম ভাঙল, দিদি?' জলের ঘড়া কাঁকালে বেলা যাচ্ছিল, কমলাকে দেখে দাঁড়াল একটু। বেলার গলা শুনে তন্ময়তা কেটে গেল কমলার। চোখ নামিয়ে তাকাল। হাসল অল্প। না। প্রথমটা কমলা কিছু বলল না, মাথা নেড়ে জবাব দিতে গিয়ে কি ভেবে পরেরটুকু কথায় সারল, 'ঘুমোলাম আর কোথায়? খাওয়া দাওয়া সারতে সারতেই···'

'আমারও তাই।' কাঁকালের ভরা কলসী চল্‌কে ডান হাতে একটু জল ধরে পা-য়ে ছিটলো বেলা, 'বন্ধের দিনগুলো দিদি কেমন হুঁস্ করে চলে যায় যে···'

সরল উজ্জ্বল সকৌতুক চোখে কমলা তাকিয়ে থাকল বেলার দিকে। বলল, 'ধরে রাখতে পারলে বেশ হত, না?'

'তা হত বই কি।' বেলা চোখে চোখে হাসল, 'হপ্তার একটা মাত্তর দিন, তাও দেখ না কেমন ফুরোয়! হাতের কাজ সারতে সারতেই সন্ধ্যে।'

'কর্তা কোথায়?' কৌতুকের গলায় শুধলো কমলা।

'শুয়ে—' বেলা মুখ টিপে গালে টোল ফেলে মিষ্টি করে হাসল যেন অন্য কিছু অর্থও আছে এই কথার।

'অপেক্ষায় নাকি ?'

'হুঁঃ, আর অপেক্ষা,' বেলা ভূরু তুলে, মাথা নেড়ে অদ্ভুত ভঙ্গি করে জোবে হেসে উঠল। '···সেই কখন থেকে খালি তাড়া দিচ্ছে, কিন্তু আমি কি করবো বলতো ? কাজটাজ শেষ না করে··· ··আব উনি তো সেই খেয়ে দেয়ে বিছানায় উঠেছেন···'

'না হয় গড়িয়ে উঠে করলেই পারতে। তুই-ই হত।'

'যাও', আচমকা হাসি ফেটে পড়ল, খুশীতে আবেগে বেলা ডানহাতে অল্প ঠেলা দিল কমলাকে। 'তুমি না দিদি···'

কে যেন আসছিল, টেব পেয়ে পরের কথাগুলো বাকি রেখে বেলা থামল। চোখ ফিবিয়ে দেখল মানুষটাকে।

অতসী। জলের কলসী কাঁকালে, হাতে জলভরা ছোট এক বালতি নিয়ে সামান্য ঝুঁকে টাল সামলাতে সামলাতে আসছে।

অতসীব পরনে ধোপাব পাট-ভাঙ্গা শাড়ি। পরিপাটি করে বাঁধা খোঁপাটা সামান্য আলগাভাবে নেমে এসে ঘাড় ছুঁয়েছে। কপালে সিঁথিতে সিন্দুর। মুখে অল্প শুভ্রতা যেন মিশেছে। মুখ-চোখের ফোলা ফোলা ভাবের মধ্যে প্রসাধনটুকু অন্য এক সুষমা দিয়েছে অতসীকে।

কমলার মন কেমন এলোমেলো মতন ঠেকল। কী যেন তাব মন ছুঁল। ছুঁয়ে সরে গেল, এখন ঘুমের ভান করা বন্ধ চোখের পাতায় চুলের সুড়সুড়ি দেওয়ার মতন এক ভাব বুকের মধ্যে অনুভব করতে পারল। যেন সেই সুড়সুড়ির ভাবটা খানিক নড়েচড়ে আস্তে করে বুক ছুঁয়ে ঘুমলো। অতসীর এই সাজগোজের মধ্যে যে প্রশান্তি, যে আনন্দ,

বেলার রগুড়ে কথার মধ্যে যে সুখের তাপ কমলা তার সঙ্গে নিজের জীবনের পাওনার হিসেব করতে গেল, ছবিটুকু মেলাতে গিয়ে তার মন ক্ষুণ্ন হল, কাতরতার গন্ধ পেল ; পেয়ে কমলার মন হঠাৎ কেমন উদাস হতে হতে থামল।

এক মুহূর্ত দাঁড়াল অতসী; ক্ষণিকের জন্যে। একটু হাসল। কি যেন বলতে চেয়ে না-বলে পেছন ফিরল। কমলা চোখে সব দেখছিল। মনে হল, তার চোখ বেঁচে আছে, কাজ করছে, মুখ মরে গিয়ে এখন সে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখানে।

অতসী চলে যাচ্ছে। কমলা মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিল। ছি ছি! এমন ব্যবহার করা উচিৎ নয়। মেয়েটা দু'টো কথা বলতে চাইছিল, বেলা আর কমলার কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যাওয়ার ভঙ্গিতে ভড়কে গেছে। ও হয়ত ভেবেছে, কিছু গোপন কথা টথা এরা বলছে—এখানে দাঁড়ান সঙ্গত নয়। মন খুঁত খুঁত করতে লাগল কমলার।

মিটমিট করে হাসছিল বেলা কমলার দিকে তাকিয়ে ; অনেকটা দুষ্টুমির হাসির মতন। শেষে কথা বলল, 'দেখলে দিদি ?'

চোখ তুলে তাকিয়ে থাকল কমলা। কথা বলল না।

'কী করে পারে বলতো ?' ডান কাঁকাল থেকে কলসীটা বাঁ কাঁকালে আনল বেলা, 'কাজকম্ম সেরে বরের সঙ্গে...' চোখ দু'টো আরও উজ্জ্বল করে ফিক করে হেসে ফেলল বেলা, 'শুল, ঘুমুল—আবার সাজগোজও হয়ে গেল—অথচ দেখ তোমার আমার...দিন যেন ঘোড়ায় চড়ে আসে।'

বেলা ছেলেমানুষের মতন কথা বলছে দেখে হাসতে গেল কমলা, হাসল না। তা বলতে পারেই তো। কত আর বয়েস হবে ? কুড়ি একুশ ছোঁয়নি সম্ভবত। মুখেচোখে এখনও ছেলেমানুষের মতন কচি কচি ভাব মাখানো রয়েছে। কেমন

গোলগাল সুন্দর মুখ, হাত পা দেহের গড়নটি পর্যন্ত নিটোল। গায়ের রঙ মলিন, কিন্তু অল্প ফর্সার ভাব মাখানো। চার বছরের বিয়ের জীবনে বেলার শরীরে-মনে কোথাও মালিন্য নামে নি। বেলার স্বামী সুস্থ সবল, স্ত্রীর প্রতি মমতাশীল···

কমলার মনের মধ্যে এলোমেলো ভাবটা মৃদু হালকা অল্প লেগে থাকার মতন ছিল এতক্ষণ, আবার যেন তার মন কেমন উদাস হল। শিশুর ঘুমিয়ে পড়ার মুহূর্তের মতন বুকের তলায় ভীরু নরম চঞ্চলতা ঝিমিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ জেগে উঠল। অদ্ভুত এক বিষণ্নতা, বিমর্ষতার ভাব ফুটল মুখে। যেন জীবন ভরে অনেক কিছু চেয়েছিল কমলা, অনেক আশা সে পুষে রেখেছিল মনে, তার কিছুই সে পেল না। সেই হতাশ মন নিয়ে তবু কমলা আর দশজনের জীবনের সঙ্গে পাশাপাশি ফেলে নিজের পাওনাটুকু যাচাই করে নিচ্ছে। বেলা, অতসী এবং এ-বাড়ির আরও কত বউ রয়েছে—কিন্তু··· কমলার মন যেন হঠাৎ চাপা গলায় ফিসফিস করে কথা বলল ··কিন্তু আমি কি পেলাম ? কী···

'তুমিতো খুব সুখেই আছ, দিদি।' আচমকা বলল বেলা, 'নিজে চাকরি-বাকরি করছ—কেমন সুন্দর স্বাধীন। আর আমরা ··আমরা ডেগ-মাষ্টারী করে, সংসার গুছিয়ে তবু দিদি'···হঠাৎ থেমে গেল বেলা। বুঝি কমলার মনমরা মুখ দেখে এক ধরনের মমতা হল। '···আচ্ছা দিদি !'

'উঁ।'

'একটা কথা শুধাই, যদি কিছু না মনে কর।'

কী কথা শুধোবে বেলা ! কমলার কপালে ক'টি রেখা ফুটে উঠল। '···বলো।' বেলার মুখের ওপর কমলার দৃষ্টি এলোমেলো হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য তার হৃদ্‌পিণ্ড যেন থেমে গিয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকল।

কি ভেবে বেলা বলল, 'আজ থাক। অন্যদিন বরং বলব।'

প্রথমে দেখেনি কমলা, পরে লক্ষ্য করল, ঘাড় ঘুরিয়ে বেলা কি যেন দেখছে। তার মুখে চঞ্চলতার ছাপ। বেলার বর উঠেছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে এদিকে তাকাচ্ছে। অল্প কাশির শব্দ করল। কমলা বুঝতে পারছিল, বেলার ডাক পড়েছে। বেলাও যেন যাওয়ার জন্যে তৈরি। অথচ চট করে যেতে তার লজ্জা করছে।

বেলা চলে গেল। কমলা তখনও দাঁড়িয়ে। চুপচাপ।

সূর্য তার রোদটুকু তুলে নিয়েছে। অল্প মেঘলার ভাব ঘন হয়ে আসছে। কুয়াশার মতন উনুন আঁচের ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। একটা দু'টো পাখির ডাক, থেকে থেকে এই বস্তির মানুষদের কলরোল। কোন ঘরে যেন হারমোনিয়ম বেজে উঠল। মাধুদের ঘরে। পরে মাধুর বেসুরো গলা শোনা গেল। গান, ঝগড়া, হারমোনিয়মের বাজনা, বাচ্চার কান্না, ছোটাছুটি চিৎকার সব মিলিয়ে বিচিত্র এক গুঞ্জন। কমলা যেন তন্ময় হয়ে এই পাঁচমেশালি শব্দের মধ্যে ডুব দিল। এই শব্দ, গুঞ্জন, ঝগড়া, চিৎকার, ফেরীওলার হাঁক— সব মিলিয়ে কমলা এবং উপকণ্ঠের হাজার মানুষ। এর সঙ্গে কমলাদের মন, হৃদয় ভাবনা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তা থেকে কমলা যেন আলাদা কিছু নয়।

এক মুহূর্ত ঝিমধরে থাকল কমলা। তার মন কোথায় হারিয়ে গেছে, ভাবনাটা মন ছুঁয়ে থেমে থাকল খানিক হালকা লঘু হয়ে। মাথা তুলে কমলা আকাশে তাকাল। আরও পরে কমলার মন সহজ সপ্রতিভ হয়ে এল।

হঠাৎ খেয়াল হল কমলার, সে একলা উঠোনে দাঁড়িয়ে। চারদিকে নানা শব্দ। সারা ঘরে মানুষ, এই উঠোনের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে বাচ্চাদের হল্লা, এই পাঁচমেশালি শব্দের

মধ্যে অন্য কিছু যেন শুনতে পেল সে। কমলার মনে হল, হাজার মানুষের এই সংসার তার বড় বেশি করে চেনা ; অনেক কালেরই পরিচিত।

শেষ-বিকেলের যেন এক গন্ধ আছে। কমলা তার ঘ্রাণে সেই গন্ধ পাচ্ছিল এতক্ষণ। কখন সে-গন্ধ মিলিয়ে গেছে। আলো মুছে এবার তরল-কালি আঁধার আসছে। কমলা নড়ল। আড়মোড়া ভাঙার মতন ভঙ্গি করল। জল ধরতে হবে ; একফোঁটাও অবশিষ্ট নেই ঘরে। রান্নাঘরের অবস্থা ছড়ানো ছিটনো। সেই দুপুরে কোনোরকমে রান্না সেরে খাওয়ার পাট চুকেছে—তারপর কিছুই আর গোছগাছ করা হয়নি। নিতাইয়ের ওষুধ তৈরি হল। এখন চা-য়ের পাট আছে। শুয়ে শুয়ে হয়ত নিতাই অস্থির হয়ে উঠছে।

কমলা ফিরল। তার মন কেমন খুঁতখুঁত করে উঠল।

অনেকক্ষণ ছাদের দিকে নিশ্চুপে তাকিয়েছিল নিতাই ; পরে জানলায়। এবং জানলা পেরিয়ে সবুজ-পাতা কুল গাছটার দিকে।

আলো সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ধূসরতা নামল। সেই ধূসর-রঙ আলো ঘন হয়ে আঁধার নামছে। সবুজ পাতাগুলো নিতাইয়ের মনে আশার আলো দিচ্ছিল। এখন, ঘন হয়ে আসা অন্ধকারে অস্পষ্ট হতে হতে সবুজ রঙ মুছে গিয়ে পাতাগুলো হারাল।

ঘরের আলো মুছে গেছে অনেক আগেই। ছাদের কাছে অন্ধকার চাপ বেঁধে আছে। সন্ধ্যা নামছে। নিতাই জানলা দেখল, ছাদ দেখল, মেঝে থেকে তাকাল দরজার দিকে। পরদার গা-ছুঁয়ে ঘন ধূসর ছায়া। তার ওপরের ধূসরতা অল্প ফিকে। নিতাই পাশ ফিরল, কাত হল, শিয়রের

দিকে তাকাল চঞ্চলতায়। বুঝি শেষ আলোটুকু দেখবার খেয়াল জেগেছিল তার মনে। আলো নেই। এক ধরনের হতাশা, দুঃখের মতন—নিতাইয়ের মন ভারী করে তুলল।

নিতাইয়ের মন খানিক স্তব্ধ হয়ে থাকল। তন্দ্রা সঞ্চারের মতন ভীষণ অবশতা তার দেহ মনকে আচ্ছন্ন করতে লাগল। বুকের তলার শব্দটা খুব আস্তে, অতি ধীরে কেমন মিলিয়ে যাওয়ার মতন—যেন মৃদঙ্গের মনোরম তাল এতক্ষণ তার কানের কাছে বাজছিল। সেই হরিসংকীর্তনের দল মৃদঙ্গ বাজাতে বাজাতে দুয়ার থেকে দুয়ারে যেতে যেতে আরও দূরে, অ-নেক দূরে চলে যাচ্ছে: তার শব্দটা এখন অত্যন্ত ক্ষীণ মিহি অস্পষ্ট হয়ে আসছে। নিতাইয়ের চোখের সামনে সব কিছু কেমন ঝাপসা হয়ে এল। '...কমলা, কমলা—' নিতাইয়ের যন্ত্রণা শব্দ হয়ে ফুটল না।

নিতাইয়ের মন হালকা পলকা পাতার মতন ঘূর্ণিতে পড়ে ঘুরতে ঘুরতে কেমন এলোমেলো হল। সামান্য অভিভূত অথচ অসংবদ্ধ চিন্তায় অতীত ছোঁয়া দিল, নড়ল—শেষে ঘন হয়ে বসল যেন। রাত্রির গন্ধ পেল নিতাই। এই ঘর, বিছানা-বালিশ, ময়লা মশারী, ছাদ, দেওয়ালের পুরনো চূন এবং শরীর, নিতাইয়ের অসুস্থ অক্ষম শরীর—তার সঙ্গে রাত্রির গন্ধটা মিলে গিয়ে খুব পরিচিত জানা গন্ধের সৃষ্টি করেছে।...নিতাইয়ের মনে হল তার পাশে অন্য এক শরীর। আর এক মানুষের। সে যেন কিছু বলছে। নিতাইয়ের মনে ভয়। পাশ না ফিরে ভয়-পাওয়া মন নিয়ে কান পাতল নিতাই।...

..."তুমি কি তোমার ভবিষ্যতের কথা ভাব নি?..."

ভেবেছি। ভেবেই এসেছি। আমি ভালবেসেছিলাম কমলাকে। তার নম্রতা ভব্যতা ব্যবহার আমাকে টেনেছে,

তার রূপ, আত্মসমর্পণ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি ভেবে-ছিলাম—

…"তোমার ভাবনা নিয়ে সমাজ নয়। তুমি জান কমলার মা-বাবার কথা ?…"

জানি। সংসারটা ভেঙেচুরে শেষ হয়েছে। তারা এখনও আছে কাশীপুরের সেই বস্তিতে। আমি কমলাকে নিয়ে কেটে পড়লাম। না হলে এ-মেয়েটা বাঁচত না। ঐ সংসার বাঁচাতে গিয়ে তার তলায় চাপা পড়ে মরত।

…"মরতই যে সে-কথা কী করে জানলে ? সে চাকরী করত, সংসার চালাত…"

জানতাম। কমলা কী চাকরী করত সঠিক আমার জানা নয়। আমি তাকে শুধিয়েছি অনেকবার, সে বলেছে, কোন কোম্পানীর মেয়ে প্রতিনিধি। কোম্পানীর মাল চালু করতে তাকে ঘরে ঘরে যেতে হয়। গিন্নিবান্নিদের ধরে ধরে প্রচাব করে। তবে এ-টুকু জানতাম, কমলা বলেছে, তার আয়ের পয়সা সংসারের চাহিদার তুলনায় কিছুই নয়। কোনোরকমে হু'বেলা যা পেটটাই চলত।

…"চলে আসার পেছনে কি কমলার মত ছিল ?"…

ছিল। থাকারই কথা। তার একটা মন আছে, স্বপ্ন ছিল, ভাবনা ছিল, বয়সও বেড়ে যাচ্ছিল—হয়ত এমনি করেই একদিন তার জীবন শেষ হত। কমলা বলেছিল, সে চায়। সুখ চায়, শান্তি চায়। তার জন্য সে মা-বাবা পর্যন্ত ছাড়তে দ্বিধা বোধ করেনি।

…"তারপর।"

তারপর আমরা চলে এলাম ; এক দিন সকালে হু'জনে মিলে কেটে পড়লাম।

…"কোথায় ?"…

নবদ্বীপ শান্তিপুর হয়ে, বহরমপুরে মাসখানেক। তারপর কলকাতায় এসে চেতলায় উঠলাম।

…"কেন এলে ?"…

আমার যা সঞ্চয় ছিল সব শেষ হল। হাতে কিছু থাকতে পুটিয়ারী কলোনীর এক বন্ধুর বাসায় এসে উঠলাম। সেখান থেকে কসবার এই বস্তিতে।

…"কমলা তখনও কি সেই চাকরীই পেল ?…"

না। আর এক কোম্পানীতে সে ঢুকেছিল। আমি চাকরী পাইনি কিছুদিন। পরে পেলাম। ছ-মাস যেতে না যেতে অসুখ।

…"কী অসুখ তোমার ?"

তাও জানি না। বলতে গেলে সে এক ইতিহাস। আগে একটু ঘা-য়ের মতন হল। ভয়ানক জ্বর। তার সঙ্গে আরও উপসর্গ। চাকরী গেল। কমলা চাকরী ছেড়ে দিয়েছিল। আবার তাকে…

…"তোমাদের বিয়ে হয়েছিল ?"…

হ্যাঁ। নবদ্বীপেই আমরা সে-কাজ সেরেছিলাম। মাত্র তিনটি লোক। আমি, কমলা আর পুরুত। বলতে গেলে, সে বিয়ে বিয়ের মতন নয়। দায়সারা গোছের। আসলে দু'জনের এক হওয়া নিয়ে কথা। মনের মিল ছিল আমাদের। আমরা পরস্পরকে পাগলের মতন ভালবেসেছিলাম। অনুষ্ঠানটুকু গৌণ হলেও ওটা দরকার। মনের সান্ত্বনার জন্য। সম্পর্কটাকে সত্য দৃঢ় করার জন্য।

…"তুমি কি মনে কর, কমলার মনের সব কথা তুমি জান।"…

মনে করতাম। এখনও যে করি না, তা নয়। তবু বলছি, কি মজার কথা জানো, হঠাৎ আমার মন একদিন পালটে গেল।

গল্পটা তা হলে বলি। শোনো, নতুন সংসার করার পর, কিছু জিনিসপত্র কিনতে হল। আমার একটা টেবিল কেনার শখ ছিল। একটা চেয়ারও। হয় না, হয় না, শেষ পর্যন্ত একদিন হুজুগের মাথায় কিনে বসলাম। রেফ্যুজি ছুতাররা যত্ন করে বানিয়ে রাস্তার ধারে যে বিক্রী করে ; তাই। সন্ধ্যার দিকে ওরা পথের ধারে পসরা সাজিয়ে বসে। সেখান থেকেই কিনলাম। কি বলব, কেমন সুন্দর, মসৃন র‍্যাদার কাজ, চমৎকার বার্ণিশ—টেবিল আর চেয়ারের দাম পড়ল তের টাকা। এত সস্তা। এখনও ঘরে আছে ; ওই কোনার দিকে—এখন তাতে কৌটা টৌটা, মশলাপাতি রাখার জিনিস, কুটোকাটি কত কিছু রয়েছে। অবহেলার পাত্র হয়েছ ওটা।

…"কিন্তু তাতে মন পালটাল কেন ?" ··

সেটা অন্য কারণ। সেই কথাই বলব। বলার আগে এ-সব ভূমিকা।

…"বলো।"…

টেবিলটা যত্ন করে বসালাম। পাশে চেয়ার। আমি বসতাম কিন্তু কমলার জায়গা নেই। তারপর ছোট চেয়ারে আমরা দু'জন এক সঙ্গে খানিকক্ষণের জন্য বসে গল্প করতাম। আমি একলা অধিকার করতে চাই নি। · মজা হল পরে। একদিন গরমের সময় মেঝেয় বিছানা পেতে শুয়েছি দু'জনে। সে দিনটা বন্ধের ছিল। আমার ঘুম পাচ্ছিল, কমলা ঘুমুতে দেবে না। ওর স্বভাবটা অমনি। সুখের প্রতি কমলার ভয়ানক লোভ। আমাকে বলত, 'দেখ, আমি স্বার্থপর মানুষ। নিজের সুখের জন্য সব ছাড়লাম। আমার বিবেককে মেরেছি—না হলে মা-বাবাকে ফেলে পালিয়ে আসতাম না। আমি শান্তি চাই, সুখ চাই তোমাকে

নিয়ে—হ্যাঁ আমরা তু'জন এমনি করে…' বলে কমলা আরও কাছে সরে এসে জড়িয়ে ধরত। পাগলের মতন।

…"এ-সব পুরনো কথা। তোমার নতুন অভিজ্ঞতার কথা যে বলবে বললে"…

ওই যা! সত্যি আমার আর কমলার পুরনো ভালবাসার গল্প বলতে গেলে আমাকে নেশায় পায়। যাক, এবার সেই গল্পটাই বলি। ওই যে বললাম, মেঝেতে তু'জনে শুয়ে ছিলাম; কমলা ঘুমোতে দেবে না আমাকে। আমার চোখে তন্দ্রা জড়িয়ে আসছিল, কমলার তুষ্টুমিতে তা ভেঙ্গে গেল। কমলা কথা বলছিল, আমি তার একটি তু'টি কথার জবাব দিচ্ছি; মাঝেমাঝে হুঁ আর না। এক সময় টেবিলের তলার দিকে চোখ গেল। কি আশ্চর্য জানো, আমার মন ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল।

…"কী দেখলে?"…

দেখলাম আমার সেই শখের সুন্দর টেবিল। তার ওপরটা, বাইরের দিকটা কত চমৎকার; রঙে, মস্থণতায় বার্ণিশে সুন্দর অথচ তলার দিকটা কী ভয়ানক জঘন্য! আমি মাথাটা আরও সরিয়ে আনলাম। দেখলাম, তলার পিঠে তক্তাগুলো অমস্থণ, পোকায় খাওয়া, তালি মারা, কাল দাগ পড়া, এবড়ো খেবড়ো। একটা তু'টো পেরেকের ধারালো, ছুঁচলো প্রান্ত বেরিয়ে আছে। আমার মনে হল, ওপর দেখে আমরা ঠকতে ভালবাসি, ভেতর কি তলার দিকে তাকাই না। ওটা দেখতে আমরা ভয় পাই। আমাদের ধারণা, বিশ্বাসকে আমরা যাচাই করতে চাই না, পাছে কলঙ্কের দিকটা প্রকাশ পায়।

…"এমনি করে কি নিজেকে বিচার করেছ কখনো?"…

না। করতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি। ওই যে বললাম ভয়। আমার অতীত অন্ধকার। ভবিষ্যৎ জানিনা। কিন্তু

আমি বাঁচতে চাই। কারণ বর্তমান আমার কাছে অত্যন্ত সত্য।

…"তোমার কি কোনো দুঃখ নেই ?"…

হয়ত আছে। বুঝি না। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার সব, ভালবাসা, ইচ্ছা, অভিলাষ নিয়ে আমি আলোকিত রঙ্গময়ী শহরের মতন ছিলাম। এখন এক প্রান্তে সরে এসেছি। গ্রামের নিস্তব্ধতা শান্তি সুনিবিড় ছায়া নেই অথচ শহর, সেই রঙ্গময়ী উজ্জ্বল শহরও আমি নই। মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে আমি গঙ্গার ওপারে, হাওড়া বেলুড় কি উত্তরপাড়ার মতন হয়েছি · কিংবা বলতে পার, এই যে আমরা আছি, বালিগঞ্জের রেলের সীমানা পার হয়ে, কসবার সম্ভ্রান্ত পাড়া ছাড়িয়ে বস্তীতে ; এই উপকণ্ঠের মতন।…

একটা শব্দ উঠল। ঘর অন্ধকারে ছেয়েছে। ফস্ করে আলো জ্বলল একবিন্দু। অন্ধকার চকিতে সবে গেল। নিতাই তার পাশে শোওয়া লোকটিকে দেখতে পেল না আর। এতক্ষণ ধরে যার কথার, প্রশ্নের জবাব একে একে দিয়েছিল। নিতাই ঠোঁট দু'টো ফাঁক করতে গেল। কি আশ্চর্য, ঠোঁটে ঠোঁট আঠার মতন লেগে রয়েছে। খুলছে না।

দুই

যদু নস্কর লেনের সকালটা এমনিই।

ভোরের প্রথম পাখি যখন ডাকে, অন্ধকার তখনও আছে। রাত শেষের সেই অন্ধকারে সামান্য আলোটে ভাব মিলে মিশে জলো-কালির মতন ফিকে ভাব ধরে। পুবের আকাশে ধনুকের বাঁকা বাঁটের মতন আলো ছড়ায় অর্ধ-বৃত্তাকারে। তারপর আকাশের ফরসা ভাবটা উঠে আসতে আসতে ছড়ায়। ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের শাখায় শাখায় ঘুম-ভাঙ্গা পাখিরা চোখ মেলে চেঁচায়। পাখা ঝাপটায়। এক সময় এক এক করে উড়তে শুরু করে। কলে তখন শব্দ বাজছে। প্রথম এক ঝলক জল আচমকা বেরোয়, খানিক ফটফট শব্দ, তারপর আর এক ঝলক; খানিক স্তব্ধ হয়ে থেকে তবে বেগে জল পড়তে শুরু করে।

এর মধ্যে জেগে উঠেছে মানুষ। বালতি, ঘড়া, বাসি এঁটো থালা-বাসনের শব্দ, শিশুর ঘুম ভাঙা চেঁচানি, কলের পারে জল ধরার প্রতিযোগিতা—সব মিলে মিশে অদ্ভুত শব্দ। দিনের শুরু এখানে।

বাই লেনের মুখোমুখি তখন ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে। সেণ্টারের সামনে লোকের ভিড়। দুধের বোতল সাজানো স্টীলের চাঙাড় নামছে। ধরাধরি করে নামাচ্ছে দু'জন লোক; পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে এখানে।

মন্দিরার টেবিলের সামনে কিউটা দাঁড়িয়ে। মন্দিরা টাকা গুণছে। পয়সাও। এবং খুব তাড়াতাড়ি কার্ড লিখছে। তাড়াতাড়িই করতে হয়, নইলে দু'টো একটা কথা শুনতে

হয়। ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ চেঁচায়, গালাগাল করে ওঠে আচমকা কিংবা আস্তে করে, খাটো গলায় অশ্লীল কথা ছুঁড়ে দেয়। সে-কথা মন্দিরার কানে পৌঁছোয়, তার মুখ-চোখে রক্তের বর্ণ ফুটে ওঠে। শুধু মন্দিরা কেন, কমলাও শোনে। শুনে কমলার চোখ ছু'টো অদ্ভুতভাবে ছোট হয়ে আসে। চোখ-মুখের কুঞ্চনে ভয় কি বিশ্রী লাগার ভাব বোঝা যায় না। চাঙাড় থেকে চটপট বোতল এগিয়ে দিতে দিতে আলগোছে মন্দিরার দিকে তাকায় কমলা। ইশারা করে। চোখেও ইশারা। চাউনির। কখনও কাজ করতে করতেই খাটো গলায় ফিসফিস করে বলে, 'একটু হাত চালাও মন্দিরাদি। লাইনে এখন অনেক লোক বাকি। অনেক।'

'করছি।' কার্ড লিখতে লিখতে কিংবা টাকা পয়সা গুনতে গুনতে মন্দিরা তাকাল কমলার দিকে। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

আর কিছু বলল না কমলা, তাকাল না। ব্যস্তভাবে হাতের কাজগুলো করতে লাগল। যেন তার তাকাবার সময় নেই। স্টীলের চাঙাড় থেকে বোতল তুলছিল, হাতে হাতে এগিয়ে দিচ্ছিল টেবিলে। তার কপালে, চোখের নিচের অল্প কালো ছায়ায় এবং নাকের ডগায় একটি ছু'টি ঘামের বিন্দু জমছে।

সকাল ন-টা কি সাড়ে ন-টা পর্যন্ত একটানা কাজ চলে। আগে ছুধই দেওয়া হত। হাফ পাউণ্ড, এক পাউণ্ডের সীল-করা খাঁটি ছুধের বোতল; এখন আবার ঘিও আসছে। ঘি, এবং মাখন। তার জন্যে কাজ যেমন বেড়েছে, খদ্দেরের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ার দিকে। আগের তুলনায় এখন অনেক লোক। তিনগুণ কি চারগুণ লোক এখন কিউয়ে দাঁড়ায়। শেষ লোকটি চলে না যাওয়া পর্যন্ত কমলার বিশ্রাম নেই।

দু' হাতে চারটে দুধের বোতল তুলেছিল কমলা। ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মন্দিরার গলা শোনা গেল, 'কমলা হাফ পাউণ্ড মাখন।'

মাখন এগিয়ে দিয়ে কমলা পেছন ফিরল।

'দুধ এক পাউণ্ড, টোণ্ড।' মন্দিরার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে যে লোকটি মাখন চাইছিল, তার গলা।

লোকটিকে দেখতে পেয়েছিল কমলা। চিনেছিল। চিনেও না দাঁড়িয়ে পেছন ফিরল। দুধের বোতল তুলতে তুলতে মন্দিরার গলা শোনার প্রতীক্ষা করছিল কমলা। মন্দিরার গলা শোনা গেল, 'টোণ্ড এক পাউণ্ড।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল কমলা। তার হাতে দুধের বোতল। মুখে চোখে ঠোঁটে কেমন এক ভাব—বিরক্তি, খুশী কিংবা অস্বস্তি বোঝা গেল না। বুক ঢিপঢিপ করছিল কমলার। ভীষণ এক ঘৃণার ভাব দলা পাকিয়ে, বুক ঠেলে, গলা পেরিয়ে উঠে আসতে চাইছিল। টেবিলে দুধের বোতল তুলে দিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়াল কমলা। বুঝি সবটুকু অস্বস্তি ইতস্তত আর ভয়ের ভাবটুকু মুছে ফেলতে চাইল।

লোকটির সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিল, এবং চোখাচোখি—চার চোখে। কমলা তার চঞ্চল চোখ নামাল। বুকের তলার শব্দটা দ্রুততালে বাজছে। লোকটি অল্প হাসছিল। পুরু মোটা কালো ঠোঁটের ডগায় চাপা মতন হাসি। নিচের ঠোঁট তুলে দাঁতে চাপছে বার বার। ঘনঘন তাকাচ্ছে কমলার দিকে।

ছি ছি! আর লোকগুলো লক্ষ্য করছে নিশ্চয়। কিউয়ে দাঁড়ান অন্যান্য মানুষ। কমলার সমস্ত শরীর ঘৃণায় জ্বালায় রি রি করে উঠল ভাবতে গিয়ে। হয়তো ওরা হাসছে, মনে মনে ভেবে নিচ্ছে এমন কথা—যা সন্দেহ, যা কৌতূহল।

শংকা উদ্বেগ ভীতি এবং কেমন এক বিশ্রী অস্বস্তিতে কমলার পা কাঁপছিল। বুকের তলার শব্দটা এখন চারগুণ হয়েছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে লোকটি! কমলা তেরছা করে তাকাবার চেষ্টা করল।…আবার এসেছ? কমলা মনে মনে রুখে উঠল লোকটির ওপর।…কেন, কেন আমার পেছু নিচ্ছ বাপু! সংসারের প্রয়োজনে, বাঁচার তাগিদে না-হয় এক সময় ভুল পথে চলতে শুরু করেছিলাম। লোকে জানত আমি কোনো বড় কোম্পানীতে চাকরী করি—মা বাবা তাই জানত। আমার স্বামীও। তাদের সে-বিশ্বাস আমি ভাঙতে চাইনি। সেই ভুল পথের পয়সায় গোটা সংসার চলেছে। হু'বেলা মা বাবা বোনকে নিয়ে পেটভরে খেতে পেয়েছি—তখন তোমার লাইনে চলেছি—এখন স্বামী সংসার নিয়ে আমি সুখ চাই। শান্তি চাই। এই শান্তির জন্য কত কি না করলাম…কমলার বুকের তলায় ভীরু উত্তেজনাটা জোর পাচ্ছিল। অত্যন্ত দৃঢ়তা ফুটে উঠছিল। কমলা এবার সরাসরি তাকাল। দেখল। না, লোকটি নেই। কোন ফাঁকে কেটে পড়েছে। নিশ্বাস ফেলল কমলা। স্বস্তির। বুকের ওপর থেকে যেন ভারী এক পাথর কে সরাল! এতক্ষণে বুক ভরে শান্তির নিশ্বাস নিল কমলা।

মন্দিরার গলা, খদ্দেরদের গলা, কমলার দ্রুততালে কাজ—তারপর এক সময় শেষ হয়ে এল কিউ। শেষ মানুষটা এখন এসে দাঁড়িয়েছে মন্দিরার সামনে। তার কার্ডখানা টেবিলের ওপর রাখা। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াচ্ছে লোকটি ব্যস্তভাবে। বিবর্ণ হয়ে এসেছে মুখ; চোখে মুখে ভাবনার ছায়া।

মন্দিরা লিখছে না, বলছে না কিছু। শুধু খোলা কলমের

নিবটা কার্ড ছুঁই ছুঁই করে তাকিয়ে আছে লোকটির মুখের দিকে।

বেশ লম্বা এই মানুষটি। দোহারা চেহারা। ফর্সা রঙ; গা-য়ে অসম্ভব রকমের লোম। অস্বাভাবিক। মাথার চুলে তেল নেই; কোঁকড়ানো চুল উস্কোখুস্কো, এলোমেলো মতন হয়ে আছে। সামান্য চাপা, আধভাঙা গালের ওপর ব্রণর দাগ। হপ্তাখানেকের না-কামানো গোঁফদাড়ি মুখে।

মন্দিরা বোধ হয় জানতে চাইছিল, কি নেবে এই মানুষটা —ঘি দুধ মাখন কী? কিন্তু কিছুই বলছে না মন্দিরা। অল্প ফ্যাকাসে মুখে তাকিয়ে আছে লোকটির দিকে। আর এই লোকটি ময়লা, পুঁটছেঁড়া, ঢোলাঢালা জামার ওপর-পকেট, নিচ-পকেট এবং ট্যাঁক হাতড়াচ্ছে। সস্তা দামের এক লুঙ্গি পরনে, তাতে ছোপ ছোপ দাগ। সোডা-কাচা করতে গিয়ে রঙ উঠে গেছে। পালিশহীন ধুলো-মলিন চিমড়ানো চটি পা-য়ে; আর তার চোখে মুখে কী, কেমন এক ভয়ঙ্কর মতন জ্বালা ফুটে বেরোচ্ছে।

সম্ভবত পয়সা নেই। থাকলে এতক্ষণে যা নেবার, নিয়ে কেটে পড়ত। এমন করে অপ্রস্তুতে পড়ে ঘামত না। মুখ নিচু করে লজ্জায় অপমানে লাল হত না। কিংবা—কমলা ভাবতে চেষ্টা করল, হয়তো সঙ্গে পয়সা আনতেই ভুলে গেছে লোকটি।

'কি চাই?' মন্দিরা ঠিক তেমনি তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

এক পলক তাকাল মানুষটি। মাথা নাড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে কার্ডখানা তুলে নিতে চাইল। না, তার দুধ চাই না, মাখন টাখন কিছু না, কিছু না।

মন্দিরা টেনে নিল কার্ডখানা। কি লিখল, তাকাল কমলার দিকে। 'দু' পাউণ্ড টোণ্ড দে কমলা।'

টোঙের বোতল এগিয়ে দিল কমলা। তাকাল অবাক চোখে। এবং কমলা দেখল, মন্দিরা তার ব্যাগ থেকে দুধের দামটা ক্যাশে রাখল। হিসেব করতে বসল মাথা নিচু করে।

চলে গেল লোকটি।·· মিল্ক সেণ্টারের সামনেটা এখন ফাঁকা। একটি দু'টি লোক চলছিল সামনের পথে, ও-পাশের জমা আবর্জনা ঘেঁষে দু'টি কুকুর ঝগড়ায় মেতে উঠেছে।

ক-টা বাজল, কমলা মন্দিরার হাত ঘড়িটা পাশ থেকে দেখবার চেষ্টা করল। দেখতে পেল না। পাশের এক অংশ ছাড়া মুখের আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। লক্ষ্য করল কমলা, মন্দিরা লিখছে না কিছু। একখণ্ড শাদা কাগজের ওপর কি সব হিজিবিজি কাটছে। মন্দিরার উদাস এবং অন্য-মনস্কতার মধ্যেও নিশ্বাসের ছন্দটা দ্রুত। করুণ বিবর্ণ হয়ে এসেছে তার মুখের রঙ।

সামনে ফাঁকা পথ। খানিক আগে এই পথে অনেক লোকের যাতায়াত ছিল; এখন শূন্য। রাস্তাজুড়ে চড়া রোদের ছটা জ্বলছে।

'মন্দিরাদি', অনেকক্ষণ ভেবে, মনস্থির করে নরম গলায় ডাকল কমলা।

'এই যে···' মন্দিরা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল হঠাৎ। আচমকা এবং আকস্মিকভাবে তার জবাব দেবার ভঙ্গিটুকু পর্যন্ত অবাকের। কমলা দেখছিল, মন্দিরার গৌর, ফর্সা, সুন্দর মুখখানা কালো। কালোমত। কেমন কদাকার কুৎসিৎ বিবর্ণ দেখাচ্ছে মন্দিরার মুখ।

হঠাৎ কেন এমন হল মন্দিরার, কমলা বুঝতে পারল না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল শুধোতে, কিন্তু কি ভেবে শুধলো না। আরও একটু কাছে সরে এল মাত্র।

হাতের ঘড়ি দেখে মন্দিরা উঠল, 'ইস, সাড়ে ন-টা বাজেরে

কমলা, আমার আবার তাড়া আছে। হিসেবটা একবার দেখে নিস তুই। আমি চললাম।'

কি যেন বলতে গিয়েছিল কমলা, বলতে পারল না। তার আগেই পা বাড়িয়েছে মন্দিরা।...'ভয়ানক মাথাও ধরেছে আমার। ছিঁড়ে যাচ্ছে।' কোঁচকান কপালে হাত দিল মন্দিরা, 'খুব কষ্ট হচ্ছে আমার।'

'আচ্ছা যাও', সহানুভূতির গলায় বলল কমলা।

ভ্যানটা ফিরে এল খানিক বাদেই। কমলা তার কাজ শেষ করে পথে নামল।

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। কোথাও ছায়া নেই। বড় ছায়া। রাস্তাটা খানিক বাঁক নিয়েছে এখানে। জলের কল ঘিরে জন-কয়েক লোক। লুঙ্গি পরা তু'জন লোক স্নান করছে সাবান মেখে, বালতি ভরে জল নিয়ে। একজন কলের তলায় বসে শুধু গামছায় গা-ডলছে। এবং গুটিকয়েক ছেলে ছোকরা, একটা তু'টো মেয়ে বালতি হাতে দাঁড়িয়ে।

কড়া রোদ এবং অস্বস্তিকর গুমোট গরম। মুখ মাথা গলার নিচ ঘামছে। ব্লাউজের ভেতরে বুকের কাছে কেমন শিরশির করছে। পা পা করে হাঁটছিল কমলা এবং ভাবছিল। তার মন, বুকের ভেতরটা কেমন শূন্য শূন্য হালকা এবং উদাস মত লাগছে।

মাঝে মাঝে কেন যে এমন হয়, কমলার মনে হয়—সে আছে, তার মন নেই। হাঁটতে হাঁটতে অনেক পথ চলে এল কমলা। কত সময় ধরে এসেছে, কোন পথে—তার কিছুই যেন সে দেখেনি। চোখে পড়েনি কিছুই। অথচ কি আশ্চর্য সে তার নিজের কথা ভাবছে না, নিতাইয়ের কথা নয়, সংসারের কথা এক মুহূর্ত মনে পড়েছিল আগে, তারপর ভুলে গিয়েছে। পুরনো দিনের কথা, মা-বাবা পারুলের

কথাও নয়—অথচ কি, কোন চিন্তায় তন্ময় হয়ে সে এলো এতদূর পথ সে-কথাও স্মরণ করতে পারছে না।

প্রায় দুপুরের ফাঁকা পথে হাঁটছিল কমলা। এতক্ষণে তার মনে পড়ল, সে কিছুই ভাবছিল না অথচ অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে। সামনে আরো রাস্তা। পথটা প্রায় নির্জন।

আরও এগিয়ে এসে মনে পড়ল কমলার, সে কারো কথা ভাবছে অথচ বুঝতে পারছে না। সে কে! নিতাই? কোবরেজ? আর্থিক অবস্থার কথা? হ্যাঁ, সব।······কত তারিখ আজ! আঠারো কি? মাসের আর বারো দিন বাকি। আজ কাল কিংবা পরশু পর্যন্ত বড় জোর চলবে; তারপর আবার হাত পাততে হবে। কাঁদো কাঁদো হয়ে মন্দিরাদির মন গলিয়ে দশ বারোটি টাকা ধার করতে হবে। কোবরেজ গা লাগাচ্ছে না, নিতাইয়ের অসুখ এক-ভাবে লেগে ছিল, হঠাৎ এখন বাড়ার দিকে। আমি কি করব, কী করব····কমলার ভাবনাটা ক্রমশ এলোমেলো হতে লাগলো। আরও পরে কি মনে হল, লাইনে দাঁড়ানো সেই লোকটির কথা মনে পড়ল কমলার। রোজই আসে লোকটি। এই সেণ্টার থেকে দুধ ঘি কেনে। এখানে কেমন করে এলো! তবে কি কমলার সন্ধান করতে করতে না কি···ইস! মনে মনে কমলা বিরক্তি এবং অস্বস্তি অনুভব করল। এবং কেমন এক ভয় আচমকা লাফিয়ে পড়ল তার বুকে।

যদু নস্কর লেন শেষ হয়ে গেল। এখন বাঁয়ে রাস্তা। ডানদিকের পড়ো বাড়ি-ঘেঁষা ঝাকড়া বড় অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় একটা রিক্‌শঅলা গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে। একটা কুকুরও। ডানদিকে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এক ঠেলা গাড়ি। কমলা খাটালের পাশ ঘেঁষে ছোট পায়ে চলা পথে এগুল।

ঘরে ঢোকবার আগেই শব্দটা কানে এসেছিল, ঢুকতে স্পষ্ট হল ; পরিষ্কার। নিতাই ককাচ্ছে। ছটফট করছে যন্ত্রণায়। বিছানার ময়লা চাদরটা কুঁচকে খানিক এলোমেলো হয়েছে। পায়ের দিকের খানিক অংশ ঝুলে পড়ে মেঝে ছুঁয়েছে।

'ব্যথাটা বাড়ল ?' কমলা তাড়াতাড়ি কাছে সরে এল।

কথা বলল না নিতাই। জ্বালা আর অস্বস্তিভরা মুখ তুলে তাকাল কমলার দিকে। তারপর পাশ ফিরে পিছন হয়ে শুলো।

'মন্দিরাদি আগে চলে গেল, শরীর খারাপ বলছিল...' কৈফিয়ত দিচ্ছিল কমলা। নিতাইয়ের পাশ ফিরে শোওয়া, যন্ত্রণার মধ্যেও চোখ কুঁচকে তাকানো—তা দেখে কমলা বুঝতে পারছিল নিতাই রাগ করেছে। অভিমান হয়েছে তার। '...সব কাজ সেরে তবে এলাম,' আঁচলে মুখ গলা গলার নিচের ঘাম মুছল কমলা, 'অনেক দেরি হয়ে গেল তাই।'

'আমি কিছু বলিনি।' নিতাই পাশ না ফিরেই বলল। 'জিজ্ঞেস করিনি।' চুপ করল নিতাই। এবং হাঁটু মুড়ে, মুঠো শক্ত করে যন্ত্রণার মতন একটু শব্দ করল।

'খুব কি বেড়েছে ব্যথা ?' কমলা একটা পা তুলে, ভাঁজ করে তক্তপোশের ধারে বসল। একটা হাত আস্তে তুলে দিল নিতাইয়ের গায়ের ওপর।

'হ্যাঁ।' একটু নড়ল নিতাই।

'ওষুধটা দেব ?'

'না।' নিতাইয়ের গলা কেমন বিকৃত শোনালো।

'মিছিমিছি ওষুধের ওপর কেন রাগ করছ ?' কমলার স্বর আরও অন্তরঙ্গ আবেগময় হয়ে উঠল। 'ওষুধে তোমার করলটা কি ?'

'আমার খুশি।' নিতাইয়ের গলায় অদ্ভুত দৃঢ়তা।

'খুশি!' কমলা দুঃখের হাসি হাসল। 'এখনও তোমার খুশি?' একটু থামল কমলা। কি ভেবে তার হাতটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে নিতাইয়ের মাথা ছুঁলো। 'আচ্ছা, আমার কষ্ট কি তোমার কিছু নয়? এই যে কোন সকাল থেকে আমি…'

'না।' নিতাই বাধা দিল কমলার কথায়।

কমলার মন-মেজাজ হঠাৎ কেমন হয়ে গেল। অল্প অভিমান তাকে অন্যমনস্ক করল।…সব বুঝেও কেন অবুঝের মতন করে এই মানুষটা! কমলা মনে মনে বিরক্তি অনুভব করল। এবং বীতস্পৃহের একটু ভাব।…কী করে সংসার চলছে, চালাচ্ছি, কেমন করে একটা রাত গিয়ে সকাল হচ্ছে, কত দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে—সে আমিই জানি। রোজগারের পয়সায় কোনোরকমে সংসার চলত—এখন তোমার ওষুধ আছে, যতটা পারি পথ্যের জোগাড় করতে হয়, তবু তুমি বোঝ না; বুঝতে চাওনা কোনোদিন। কমলা নিশ্চুপে, মনে মনে যেন নিতাইকে শোনাচ্ছিল তার কথা।…দুঃখের দিন আমার আর ফুরোয় না…। অভিমান দুঃখ ক্ষোভ এবং অল্প ঘৃণা কমলার মনকে বীতশ্রদ্ধ বিক্ষুব্ধ এবং ভারী করছিল কমলা তা প্রকাশ না করে সহজ হতে চাইল।…'আমাকে বিয়ে না করলেই ভাল হত তোমার, না?' সরস গলায় শুধলো কমলা।

একটু নড়ল নিতাই। কাতর আর্তনাদের মতন একটু শব্দ উঠল তার মুখ থেকে। অতি কষ্টে, নাক মুখ চোখে কুঞ্চন তুলে সোজা হয়ে শুতে গিয়ে থামল। পরে আরও কষ্টে চিৎ হয়ে শুলো। তার মুখের অসহ্য যন্ত্রণা এবং কষ্টের মধ্যেও একটু হাসির ভাব যেন লেপটে রয়েছে।

'ইস্, খুব যে উৎসাহ দেখছি! বললাম আর বাবুর মুখে

হাসি যেন ধরে না।' কমলা এই অসহ্য বিরক্তিকর সময়কে লঘু করতে চাইল।

নিতাইয়ের ম্লান ঠোঁট দু'টো অল্প নড়ল। তার বুকের ওপরে কমলার হাত। নিতাই তার একটা হাত আস্তে করে সেই হাতের ওপর রাখল।

তিন

আচমকা শব্দ উঠল দরজায়। কমলা প্রথমটায় অন্য কিছু ভেবেছিল; বাড়ির ছোট ছেলেমেয়ে কিংবা কুকুরটা বিড়ালটাও হতে পারে। পরে কড়ানাড়ার শব্দটুকু ভাল করে শুনতে পেয়ে বুঝতে পারল বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে। ···'কে'! কমলা কোলের ওপর থেকে ঘুমন্ত নিতাইয়ের হাত আস্তে নামিয়ে দিয়ে উঠল।

জবাব এল না।

'কে!' কমলা আরও এগিয়ে এসে দরজার পর্দা সরিয়ে দেখল।···'সুনুদা নাকি রে? আয়, ঘরে আয়।'

কিছু না বলে সনৎ ঘরে ঢুকল।

ঘরের কোণ থেকে চেয়ারটা টেনে এগিয়ে দিল কমলা। 'নে, বোস।'

সনৎ খানিক অবাক চোখে তাকিয়ে রইল কমলার দিকে। তারপর গোটা ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিল ভাল করে।

ছায়ামতন আবছা অন্ধকার ঘর। খুব স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না কিছু। এ-পাশে একটা আলনা মতন মনে হল সনতের, এক কোনায় টেবিলের ওপর সংসারের পাঁচরকম জিনিস। তার ওপরে ঘন ছায়া। তলার দিকে অল্প আলো মিশেছে। সামান্য দূরে আঁচ-ওঠা উনুনের ওপর একটা হাঁড়ি চাপানো। উনুনের মুখের ফাঁক দিয়ে তপ্ত আঁচের ছটা ছড়িয়ে পড়েছে অল্প জায়গা জুড়ে। হাঁড়ির ভেতরে কিছু ফুটছে বুঝি—টগবগ টগবগ শব্দ উঠছে।

এখন কি যে করবে বুঝতে পারল না কমলা। এতদিন পরে সনতকে দেখে তার যেমন আনন্দ হচ্ছিল, সেই সঙ্গে অনুভব করতে পারছিল কমলা, কেমন এক ধরনের ভয়ও যেন তার মন ঢেকে দিচ্ছে। কথা বলতে পর্যন্ত তার কেমন লাগছে। কিন্তু কেন? এই কেনর উত্তরও খুঁজে পেল না কমলা।

খানিক সময় পার হয়ে গেল। ঘরময় অদ্ভুত নিস্তব্ধতা; যেন এ-ঘরে কেউ নেই। থাকেও যদি তবে তারা অন্য এক ঘুমে অচৈতন্য কিংবা নিরুদ্ধ নিশ্বাসে কোনো বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বোবা হয়ে আছে। জলফোটার মতন মৃদু মিহি শব্দ আছে একটা—তাও যেন মুমূর্ষু রোগীর বুকের তলার শেষ স্পন্দনের মতন।

এ-দিক ও-দিক ভাল করে দেখে আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গি করে কমলার দিকে তাকাল সনৎ। চোখের ইশারায় বিছানা দেখিয়ে নরম গলায় শুধলো, 'অসুখ?'

'হ্যাঁ।'

'কবে থেকে?'

'তা অনেক দিনই হল।' কমলা কথায় কথায় অনেকটা স্বাভাবিক হল।...'তুই ঠিকানা কোথায় পেলি রে সুনুদা?'

'পেলাম।' সনৎ অভিজ্ঞতার হাসি হাসল। 'তুই লুকোতে চাইলে কি হবে, দেখ আমি কেমন খুঁজে বের করেছি।' পর্দার দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার চোখ ফেরাল সনৎ, 'তা, বেশতো আছিস সংসার টংসার পেতে।'

কমলা কিছু বলল না।

'হ্যাঁরে কুমু, মামা-মামীর খবর টবর কিছু জানিস?' জবাবে কমলা কিছু না বলাতে সনৎ নিজেই বলতে লাগল, 'আমি জানতাম না। একদিন হঠাৎ কি মনে করে গিয়ে

হাজির। সব শুনলাম'। একটু থেমে থেকে বলল সনৎ, 'নীহার মারা গেল, তুই সংসার ছেড়ে এলি···সেওতো আজ ছ'বছরের কথা রে। এর মধ্যে একবার খরব-টবর নিলে পারতিস।'

'পারতাম।' দ্রুত নিশ্বাস নিতে গিয়ে বলল কমলা। তার গলায় অল্প দুঃখ একটু অভিমানের স্বর যেন জড়ানো।

'মামা এখন অনেকটা ভাল।' সনৎ উনুনে চাপানো হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে চোখ ফেরাল, 'এইতো সেদিনও গিয়েছিলাম। ওরা এখন কাশীপুরে নেই····'

'কোথায়?'

'আলমবাজারে উঠে গেছে। মোটামুটি একটা চাকরী পেয়েছে মামা···যাক গে ও-সব কথা, একটু চা-টা খাওয়াবি নাকি? না, অন্যায় করেছি বলে তাড়িয়ে দিবি?' মুখে অল্প শব্দ করে সরস গলায় হেসে উঠল সনৎ।

কমলাও হাসল। 'কেন, কিসের আবার অন্যায় করলি?'

'এই যে হঠাৎ এসে উঠলাম।'

'উঠবিই তো।' কমলা ভাতের হাঁড়িটা উনুন থেকে নামাবে কি না ভাবছিল। '····পিসিমা পিসেমশাই কেমন আছে রে?'

জবাব দিল না সনৎ।

'ভালো আছে?' কমলা উনুনের পাশে বসে চোখ ফেরাল।

সনৎ নির্বিকার। চুপ। নিচ পকেট হাতড়ে একটা বিড়ি বের করে, উল্টো দিকে ফুঁ দিতে দিতে উঠে এল। বসল উনুনের পাশে।

একটা কাগজ সরু করে মোচড়াতে লাগল কমলা। সনৎ তার বিড়িটা উনুনের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে ধরাল। জোরে

জোরে টানল কয়েকবার।...'তুই এখন দুধের ডিপোয় চাকরী করিস না-রে?'

'হ্যাঁ।'

'তোর আগের চাকরীটা ছেড়ে দিলি?'

কমলা কিছু বলল না। তাকাল না।

ঘরের ছায়া ঘন হয়ে এসেছে। এতক্ষণ তবু মুখ চোখ দেখা যাচ্ছিল, অস্পষ্ট আলোয় গোটা ঘরের একটা রূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। এখন কেমন সব মুছে মুছে যাচ্ছে। কমলা সরু করে মোচড়ানো পাকানো কাগজ জ্বালিয়ে ডিবে ধরাল। গোটা ঘর আলোর রূপ পেল। এতক্ষণে যেন ভাল করে সনৎকে দেখল কমলা। গায়ে পুরনো সার্ট, ঢোলা মতন। খুব সম্ভব পিসেমশাইয়ের জামা। পুরনো একটা ময়লা ফুলপ্যাণ্ট; তাতে মোচড়ানো দুমড়ানো ভাব। মুখময় দাড়ি। চোখ দু'টো কি ভয়ানক কোটরে ঢুকেছে। গাল ভেঙে ভেতরে ঢোকা, প্রখর হয়েছে চোয়াল। সনতের ভাবে ভঙ্গিতে কথায় এই পৃথিবীর প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা বীতশ্রদ্ধের ভাব। জ্বলজ্বলে চোখের তারার আগুনে সে যেন সব কিছু পুড়িয়ে দিতে চাইছে।

গলগল করে একমুখ বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ল সনৎ। 'কেউ ভাল নেই।...যাক মরুক; সব শালা মরে সাফসুফ হয়ে যাক।'

ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে চা-য়ের জল বসিয়েছে কমলা। জল ফুটে উঠল। আধ চামচটাক চা ঢেলে দিয়ে কেটলি নামাল। গুঁড়ো দুধের কৌটাটা খুঁজছিল কমলা। 'তুই একটা সুবিধা-টুবিধা করলে তবু....'

'কি করব? দেশে শালার চাকরি নেই। কত তেলাব, পায়ে ধরব? চার বচ্ছর ধরে এমপ্লয়মেণ্ট অফিসে বেকার

ঘুরছি। ভদ্রঘরে জন্মেছি—নইলে মোটঘাট বইলে, ঠেলা রিক্শা চালালে শালার পেট ভরত। সে-পথও নেই আমাদের…'

'ওই যা, দুধ নেই রে সুনুদা।' মুখ-খোলা, মরচে ধরা বার্লির কৌটো নেড়ে তলার দিকে ছিটেফোঁটা লেগে আছে কিনা দেখছিল কমলা।

সামান্য লেগেছিল তলার দিকে। চামচে চেঁছে চেঁছে তাই তুলল কমলা। চা বানাল।

'তুই একবার যাস। মামী দুঃখ করছিল। পারুলটা বেশ বড় হয়েছে রে। ইস্কুলে পড়ছে আবার। ওই মেয়েটা বড় হয়ে যদি মামী মামাকে দেখে।'

কমলা চুপচাপ বসে। হঠাৎ তার মনে হল, বুকের তলার কোথায় যেন এক শক্ত বাঁধন ছিল তার, হঠাৎ তা ছিঁড়ে গিয়ে সমস্ত শরীর কেমন আলগা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে।

বিকেলে বেরিয়েছিল কমলা। কোবরেজের কাছে দু'দিন ধরে যেতে হচ্ছে। হাতে যা কিছু ছিল সব শেষ হয়ে এসেছে। মাত্র এগারো আনা পয়সা আঁচলের গিঁটে বাঁধা। কোবরেজ এসেছিল খানিক আগে। শেষ কথা বলে গেছে। নিতাইকে বাঁচাতে হলে ডাক্তার চাই। হ্যাঁ, ডাক্তার। কোবরেজের কথা শুনে নিতাই হঠাৎ কেঁদে আকুলি বিকুলি করেছে। তারপর চুপ। কমলাও বলতে পারেনি কিছু। তার মনের মধ্যে তীব্র এক অনুশোচনা সেই থেকে জ্বলছে।

আরও পরে সনৎ উঠল। উনুনে তখন ভাত ফুটছে। ওতলাচ্ছে। ঢাকনিটা তুলছে না কমলা। তুলতে পারছে না। ঘরে আজ দু'দিন কিছু নেই। ভাত বসাবার আগে তরকারির ঝুড়িটা টেনে নিয়ে দেখেছে কমলা। এক-আধটা

আলুটালু যদি থাকে তো—ভাতে দেবে। কিন্তু হিঞ্চে-কলমীর একটি আঁটি ছাড়া আর কিছু ছিল না। গোটাকয়েক কাঁচা লঙ্কা ছিল, তাও পচে হেজে বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছিল। কমলা বাসি, পাতা-খসা হিঞ্চে শাকের আটিটা ভাল করে বেঁধে, ধুয়ে, ভাতে ছেড়েছে। এখন ওৎলানো হাঁড়ির ঢাকনা তুললে ফেনার সঙ্গে যদি আঁটিটা উঠে আসে, সনৎ দেখবে। নিজের দৈন্যতাকে এমন করে খুলে দিতে পারল না কমলা।

'দেখিস কমলা, তোদের ডিপোর বাবুদের বলে কয়ে দেখিস। বিড়ি চা-য়ের খরচাটা উঠলেও বাঁচি। নইলে মরে যাব। গঙ্গায় টঙ্গায় ডুব মেরে খতম হয়ে যাব। আর আসব না।'

আঁচলের গিঁট খুলল কমলা। সনৎকে কিছু দিতে হল। না দেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু সনতের কথা শুনে কমলার বুকের ভেতর জ্বলে যাচ্ছিল। ভয়ানক এক যন্ত্রণা ফুটছিল।

'···দে না কমলা। তুই চাকরি করিস, দু' আনা পয়সা দে। সারা দিন গেলে দু'টো বিড়ি কেনবার ফুটো পয়সা জোটে না। মা দেয়না ; নেই। বাবার পকেট গড়ের মাঠ। আমরা শালা ভিখিরি হয়ে গেছি রে···'

দু' আনা নয়, চার আনাও না—গোটা একটা আধুলিই তুলে দিল কমলা সনতের হাতে।···'তুই আসিস সুনুদা, মাঝে মাঝে এলে তবু দু'টো কথা বলতে পারব। সুখ দুঃখের কথাটা পর্যন্ত বলবার লোক নেই আমার।'

সেই যে ঝিমধরে পড়ে আছে আর উঠল না নিতাই সনৎ চলে যাওয়ার পর ক-বার ডেকেছে কমলা। নিতাই

জাগেনি। গাঢ় ঘুমের তলায় সে জড় পদার্থের মতন পড়ে রয়েছে বিছানায়। কমলা ওষুধ তৈরি করল, ডাকল। বার্লির জল ফুটিয়ে ডাকল—নিতাই তার গাঢ় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন চোখের পাতা মেলতে গিয়েও পারল না। কোনোরকমে হাঁ করে তরল ওষুধের খানিকটা আড়ষ্ট জিভে নিল; তারপর চুপ। চেষ্টা করে কমলা দু' চামচ বার্লির জল খাইয়েছিল; বাকি-টুকু এখনও পড়ে আছে।

ঘর অন্ধকার। বাতাস বন্ধ। যেন মুখ-চাপা কোনো গর্তের মধ্যে আটকা পড়েছে কমলা। ক্লান্ত, ক্ষত-বিক্ষত, আহত তার দেহ নির্জীব অলস। অতল গাঢ়তা নিয়ে অন্ধকার দাঁড়িয়ে। ঘন জমাট ধোঁয়ার মতন এই ছোট ঘরে অন্ধকার পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। জড়িয়ে জড়িয়ে তালগোল পাকাল, আবার ভাঁজে ভাঁজে খুলে গেল। এখন ঢেউয়ের মতন অল্প মৃদু নড়ছে।

সামান্য তন্দ্রার ভাব এসেছিল। কমলার মনে হচ্ছিল তার শরীর হালকা লঘু পলকা পাতার মতন হয়ে আচমকা ঘূর্ণিতে পড়ে পাকিয়ে পাকিয়ে উড়ছে। সে ওপরে উঠছে। অবশ চেতনায় এই অনুভব খানিকক্ষণ তাকে শান্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রেখেছিল, পরে মনে হল সে জেগে, খোলা চোখে অন্ধকার দেখছে। মনের বিচলিত ভাবটা চড়া সুরের মতন বেজে উঠছে।

· এখন রাত কত! অন্ধকারে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করল কমলা। তার ভাবনা ভাবনাই রইল—বুঝতে পারল না কিছু। একটু নড়েচড়ে শুতে গিয়ে নিতাইয়ের গা-য়ে হাত ঠেকল। কী ঠাণ্ডা! কমলা চমকে উঠল। বসল। বুকে হাত রাখল নিতাইয়ের। স্টীমারের চাকায় জল মথিত করার শব্দ···অনেক অনেক দূর থেকে যেন আসছে।

নিতাইয়ের নাকের কাছে হাতের পিঠ ধরল, মৃদু তপ্ত নিশ্বাস লাগল হাতে।

ঘুম আসছে না কমলার। অপরাধবোধ, গ্লানির জ্বালা তার শরীর থেকে ঘুমের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত শুঁষে নিয়েছে। নিতাইয়ের সেই কান্নার মুহূর্তটি অন্য এক কান্নার রূপ নিয়ে কমলার বুকের তলায় জমেছে।...শেষ পর্যন্ত কোবরেজ উঠে পড়েছিল মুখ বিকৃত করে। 'সাবান আছে? একটু জল দাও হাতে।' কোবরেজ হাত ধুয়ে এসে আর একবার দাঁড়িয়েছিল নিতাইয়ের কাছে। নাকের ডগা থেকে চশমাটা তুলে দিয়ে বলেছে, 'খারাপ অসুখ, ইতর পাড়ার...'

'কী বললেন!' নিতাই চিৎকার করে উঠেছিল আচমকা। তার চোখ দু'টো অস্বাভাবিক রকমের বড় হয়ে গেল, ভূরু উঠল কপালে। তারপর চুপচাপ।

'ভেতরে কিছুই নেই।' কোবরেজ বলছিল। 'আসলে অসুখটা অন্য—এটাও ছিল, হঠাৎ ফুটে বেরিয়েছে। ডাক্তার দেখাও।'

কোবরেজ চলে গেল। কমলা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল খানিক। কত কি ভাবল। শেষে বিছানার কাছে সরে আসতে কান্না উঠল।

'না না না,' আচমকা কেঁদে উঠল নিতাই। 'মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা। তুমি বিশ্বাস কর কমলা, আমি যাইনি। কখনও যাইনি খারাপ পাড়ায়।'

কমলা স্তব্ধ অনড় কাঠ। নিতাইকে বিশ্বাস করেছে—অবিশ্বাস যতটুকু তা নিজের ওপর। কমলা তখন ভগবানকে ডেকেছে মনে মনে। মুখ ফুটে বলতে পারেনি, হ্যাঁ, এ-অসুখ আমি দিয়েছি তোমাকে। হয়তো আমার শরীরে বাসা বেঁধেছে এই বিষ। কেন বাঁধবে না, আসলে আমি ধর্মতলার

এক গলিতে মাসাজ ক্লিনিকে চাকরী করতাম—সে যে কি জঘন্য চাকরী তুমি বুঝবে না। যে-কোম্পানীর নাম করতাম, আসলে সেটা মিথ্যা। কেন করব না, মা বাবা বোনকে বাঁচাবার, নিজের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষার কাছে হেরে গিয়ে আমি আমার ইজ্জতকে বেসাতি করেছি। দেহে বিষ কুড়িয়ে নিয়ে বাঁচার অমৃত পান করতে চেয়েছি। পরে এই ভুলটুকু ধরতে পেরেছিলাম আমি। বিষের শরীরে অমৃত সয় না। আমার মনে পবিত্রবোধ জন্মাল। একদিন স্বার্থপর হলাম সত্যি। না হয়ে উপায় ছিল না। লতার মত আমি এক ঝাকড়া গাছকে জড়িয়ে উঠতে চেয়েছিলাম। চাইলাম। সুস্থ পবিত্র বাঁচার স্বপ্ন আমাকে মা-বাবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিল।

কমলার হঠাৎ মনে হল, অমৃতের লোভই তাকে বিষাক্ত করেছে। কথাটা ভাবতেই তার মন অসীম বিরক্তিতে ঘৃণায় গ্লানিতে ভরে উঠল। '···মা', কমলা করুণ ক্লান্তির গলায় ডাকল। তার মুখে সেই পবিত্র ডাক ফুটল না।···মা মা মা—কমলা তবু এই নামের এক পবিত্র মূর্তিকে মন দিয়ে ছুঁতে চাইল···। যেন হেরে গেছে কমলা। সংসার, সমাজ, মা-বাবা এবং নিজের স্বামীর কাছে পর্যন্ত।···কিন্তু হারতে আমি চাইনি। কমলার মনের মধ্যে অসহ্য এক যন্ত্রণা ধোঁয়ার আকারে জমে জমে এখন বেরিয়ে আসার পথ চাইছে। শেষ পর্যন্ত কমলার মনে হয়েছে, জীবনে সে কী পেল? এই পাওয়ার হিসেব বিভ্রান্ত করেছে কমলাকে।···কিছু না পাই, জগৎ চিনেছি—কমলা যেন অন্ধকারকে বলল। কত রকমের সংশয় সন্দেহ অবিশ্বাস নিয়ে আমরা বাঁচছি···আসলে এই পৃথিবী যত নির্মম নির্দয় ভেবেছি ততটাই কি সত্যি? হয়তো নয়, হয়তো তাই—আমরা নিজের নির্মমতা ঢেকে, কুৎসিৎ

কদর্যতা গোপন করে জগতের ওপর দোষ দিচ্ছি। বাঁচার সুখ নিয়ে আমরা নিয়ত মরতে চাইছি···খারাপ পথই আসল পথ নয়; মন্দিরাদি স্বামীর সংসার ছেড়ে, মাতাল মদ্যপ স্বামীকে ত্যাগ করে যে-সুখ চেয়েছিল, সে-সুখ তাকে শান্তি দেয়নি। মন্দিরাদির জীবন এখন সুখের। বিষ সাগরের তট থেকে অমৃতের নুড়ি কুড়িয়ে পেয়েছে মন্দিরাদি। আমরা পাপচোখে মানুষের সেই পবিত্রতা খুঁজতে চাই না।

যতবার কমলা ভাবছে, সে হারবে না, তত তার মন ছুটে চলেছে। শহরের সীমা ছাড়িয়ে কোথায়? কতদূরে? এই কলরোল, শহর কমলার মনকে বিষাক্ত করছিল। অন্য এক ছায়ার জগৎ শান্ত সুনিবিড়—কমলা খুঁজছে··। আগের কমলা যা খুঁজেছে, যে-লোভে পাগল হয়েছে, জীবনের সবটুকু সুখকে নিজের করে পেতে চেয়েছে; স্বামী, ঘর, পরিপাটি বিছানা, সোহাগ আদর—এই জীবনে কি আছে, কমলা যেন তার সবটুকু জেনে নিয়ে এখন পালাতে চাইছে দূরে—ভীত পরাজিত স্বার্থপর মানুষের মতন।

ডুবে ডুবে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে কমলা—তার চোখে অন্ধকার নেই, আলো নেই, রামধনুর সাতটি রঙের একটিও নয়, অথচ একটি রঙ আছে—কী রঙ···কোন রঙ···কেমন রঙ; সব বর্ণহীন অথচ তার রঙ আছে—মনের রঙ···? মনের রঙ কেমন! লাল নয়, সাদা নয়, নীলাম্বরী শাড়ি নয়, গাছের সবুজ পাতা নয়, বিকেলের রক্তাক্ত মৃত্যু নয়, সরষে ফুলও না, গোলাপ কি কলমী কিংবা কল্কি ফুল—জল, মাটি, দোয়েল পাখি—কিছু না। কমলা তার মনের মধ্যে ডুব দিয়েছে; অথচ জেগে, চোখ মেলে সে রঙ মেলাতে পারছে না।

এত নিঃসঙ্গ লাগছে কমলার। মনে হচ্ছে সে একা। নিতান্ত একাকী। এ-জগতে তার আপন বলতে, আত্মীয় কি

বান্ধব বলতে কিংবা বাবা-মা স্বামী বলতে কেউ নেই। কেউ নেই, কেউ না···। এই বিরাট বিশাল পৃথিবীতে ঝড়ের ঘূর্ণিতে একটিমাত্র ঝরা পাতার মতন সে উড়ছে···উড়ছে··· ঘুরপাক খেতে খেতে কোথায় চলে যাচ্ছে···কোথায়, কমলা জানে না। আরও পরে কমলার মনে হল, কে মরল। নিতাই! আচমকা কমলা কেমন হয়ে গেল। · দোহাই ভগবান, দোহাই—সব নাও, যত বড় শোকের খবর হোক আমাকে দাও কিন্তু···তুমি আমার স্বামীকে নিও না। তন্দ্রার ঘোরের মধ্যে চমকে ওঠার মতন কমলা কাঁপল। তার অবশ শিথিল হাত নিতাইকে ছুঁল। ছুঁয়ে ঘুমিয়ে থাকল যেন।

কমলা স্বপ্ন দেখল :

···এই পথ ধরে কমলা আসছে। শহরের বড় বড় রাস্তা, বিরাট বিশাল বাড়ির সারি ছাড়িয়ে, ছোট খালের পুল পেরিয়ে, তারপরও বাঁয়ে। পথ এখানে অল্প ছোট ; কাঁচা নয়, পাকাও না—কতকাল আগের পাতা ইট, ঘষায় ঘষায়, রৌদ্রে জলে ধুয়ে এবড়ো-খেবড়ো অবন্ধুর। গেরুয়া রঙের ধুলোর সঙ্গে মাটিও মিশেছে। এখন তার রঙ আরও ফিকে —তাতে সোঁদা মাটির মতন গন্ধ। পেছনের পথে শুধু বাড়ি। গাছপালা নেই। সারি সারি আলোর থাম ছিল। এখন একটা দু'টো গাছ পড়ছে। উঁচু পুলের ওপর দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হয়, এই পথের প্রস্থ ক্রমশ কমেছে। কমতে কমতে আরও চেপে, অনেক দূরে গিয়ে দড়ির মতন সরু সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। তারপর আর নেই।···কমলা আসছে এই পথে। তার গাড়ি টানছে দু'টি গরু। গ্রীষ্মের চড়া রোদে পথ জ্বলছে। জল ফোটানো বর্ণহীন ধোঁয়ার মতন পথ থেকে এক ধরনের বাষ্প উঠছে। গরু দু'টি শীর্ণকায়, জিরজিরে হাড় তাদের যেন গোনা যাচ্ছে। কাঁধে দগদগে

ঘা—গুটিকয় মাছি সেই কদর্য কুৎসিৎ ঘায়ের লোভে চক্কর খেয়ে উড়ছে। ওরা যাবে—যতদূর এই ঘা নিয়ে চলবে গরুগুলি। সেই ঘায়ের ওপর জোয়াল চেপে বসেছে। নিচু পথে ওরা লেজ তুলছে, উঁচু পথে কাৎরে কাৎরে—যেন টানতে পারছে না গাড়ি। গাড়োয়ান মারছে—ছ'টি গরুর লেজ ধরে মুচড়ে দিচ্ছে জোরে। কমলা জানে না সে কোথায় যাবে! অথচ তার যাওয়ার কথা—তাকে যেতে হবে। কোথায়!……

…গাড়ি যাচ্ছে যাচ্ছে, দূর থেকে দেখা সরু পথ আরও দূরে, সামনে সরে যাচ্ছে। এখন গাছ-গাছালির ভিড়, বেতসের কুঞ্জ, ফণীমনসার ঝাড়, বাতাসে দোল খাওয়া ধানের ক্ষেত, তেঁতুল বটের ছায়া—বনতুলসীর ঝোপ; পথ তবু দূরে এগিয়ে গেছে।

…বেলা পড়ে এসেছে কখন, পথের শেষ নেই। পথ এগিয়ে গেছে। কমলার গাড়ি থামল। কমলা নামল। ছোট জলাব পাশ দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। দীর্ঘ ঘাস, তেলাকুঁচ লতার জটিলতা, ধুতুরা গাছের ছ'টি ফুল আকাশের দিকে মুখ তুলেছে, লেবু ফুলের মিষ্টি গন্ধ আসছে, জলার পাড় ঘেঁষে কলমীলতার ঘন সন্নিবেশ, বেগনি রঙের একটি ছ'টি ফুল, শশার মাচানে পুচ্ছ নাচিয়ে একটা দোয়েল ডাকছে…

সুতরাং এই সময় তখন, যখন কমলা পেয়ারা তলায় এসে থামল। এই সেই চেনা জায়গা—ছ'টো পায়ে চলা পথ মিশেছে এখানে।

…এখানে অনেক ঘর, পর পর, সারি সারি, এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়ার পথ অন্ধকার। কমলা আলো জ্বালল। এক দীর্ঘ বারান্দা—ঘরের চাইতেও যেন অনেক বড়, বিরাট

উঁচু ছাদ, নিরানন্দ, শূন্য শূন্য ঝকঝকে এবং ঠাণ্ডা। ছোট এক দরজা; একদিন আগুন লেগেছিল, পাল্‌লা পুড়ে কয়লার রঙ ধরেছে। কোণের দিকে জলের কুঁজো। কমলা দরজার দিকে এগুল। ভয়ঙ্কর, অকারণ ভয় জাগল তার মনে, অবশ অসাড় তীব্র ভীতি তার বিশ্বাসকে ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে···

···এক বুড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে। সে মাথা নিচু করল, মাথা নাড়ল। তার গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে, সে কি যেন বলল বিড়বিড় করে। কমলা বুঝল, এই ঘরে তার দেহ আছে। মৃত দেহ।

চার

যদু নস্কর লেনের মিল্ক সেণ্টারের সামনে লোক লাইন কিউ। মন্দিরা মুখ-মাথা নিচু করে কার্ড লিখছিল। হাতে হাতে বোতল এগিয়ে দিচ্ছিল কমলা। আর কমলা মুখ তুলে বার বার দেখছিল—কত লোক বাকি আছে আর। লাইনে দাঁড়ানো কতজন মানুষ। লম্বা, বড় কিউ দেখে কমলার অস্বস্তি লাগছিল ; অসহ্য। কখন লাইন শেষ হবে, হিসেব-পত্র ঠিকঠাক করবে মন্দিরাদি, উঠবে—কমলা মনে মনে সময় গুনছিল।

আজ মন্দিরাদি কি করবে, সে-কথাও ভাবছিল কমলা। দু-দিন ধরে দেই-দিচ্ছি করে একটা পয়সাও দেয়নি। পরশু বলেছিল, 'দেব, কাল তোকে কিছু দেব কমলা। আমার কাছে থাকলে তোকে দিয়ে দিতাম।' খুব আশা করে ছিল কমলা। ভেবেছিল, যেমন করে হোক মন্দিরাদি কিছু ধার দেবে। দু' চার টাকা যা হোক পেলে ক-টা দিন চলবে। কিন্তু কালও দেয়নি। কিছু দিতে পারেনি মন্দিরাদি। 'একটা দুটো সিকি আধুলি পর্যন্ত আমার কাছে নেই। হাত শূন্য। কী করে চলছে, চালাচ্ছি তুমি বুঝবে না মন্দিরাদি।'

…আমি কি করব ? আজ যদি মন্দিরাদি দু' পাঁচটা টাকা না দেয়—আমার পথ নেই। কমলা মনে মনে বলছিল। লোকটাকে ইশারা করব ? করলে থাকবে, অপেক্ষা করবে মানুষটা। যদি মন্দিরাদি না দেয়—এ-ছাড়া আমার পথ নেই। অন্য কোনো উপায়। স্বামী সংসার নিয়ে আমি বাঁচতে চেয়েছি চাইছি। কিন্তু টাকা চাই, নিতাইকে বাঁচাবার জন্য ডাক্তারের

খরচ। কমলা বাঁ-চোখের ভুরু নাচিয়ে, চোখের পাতা আধ-বোজা করে ইশারা করল লোকটাকে।

লোকটা একটু হাসল। লাইন ছেড়ে দিয়ে উল্টোদিকের চা-য়ের দোকানে গিয়ে বসল।

কমলার চোখ দু'টো জ্বলছিল বুঝি। শরীরের, মনের কোথায় যেন চাপা দেওয়া আগুনের আঁচটা জোরে জ্বলল, ভয়ানক জোরে; দাউ দাউ করে।...এই আগুন দিয়ে কি পুড়িয়ে মারা যায় না? আমার শরীরের সবটুকু বিষ ঢেলে দিয়ে কি শাস্তি দেওয়া যায় না সকলকে...সমাজ, সংসার, মানুষ, সব—সব কিছুকে? কমলার মাথার মধ্যে, মগজে চিন্তাটা এলোমেলো জট পাকাচ্ছিল। লাটিমের মত ঘুরপাক খাচ্ছিল অস্থির ভাবনাটা।

...কাল আধপেট খেয়েছি—এক ঘটি জলে পেট ভরেছি। আমার স্বামীর পথ্য জোটাতে পারি না, ওষুধ নয়; চিকিৎসা হয় না। আজ দু'দিন ধরে মানুষটা অজ্ঞান, বেহুঁশের মতন পড়ে রয়েছে। কার জন্য, কিসের জন্য, কেন এমন হল, কেন এমন হয়...বুঝি কমলা মনে মনে ঈশ্বর ভগবান কিংবা সহানুভূতিশীল কোনো মানুষকে সামনে কল্পনা করে তাকে বলছিল। ফুলছিল। মনের মধ্যে এলোমেলো বাতাসের ঝাপটা। বীভৎস এবং পৈশাচিক। রাগ, দুঃখ, অভিমান, ক্ষোভ এক সঙ্গে।

...আমি কি করি, কী করব! গলা টিপে মেরে ফেলব আমার স্বামীকে, বিষ খেয়ে মরব নিজে; কী? কমলা যেন জলের তলায় ডুবে যাচ্ছে। থই পাচ্ছে না।

পাঁচটা টাকা দিয়েছে লোকটা। তাই নিয়ে ডাক্তারের

কাছে এল কমলা। ডাক্তার চোখ কোঁচকাল,—'অসুখ কতদিনের ?'

'মাস ছ—ছয়।' কমলা ঢোঁক গিলল।

অনেকক্ষণ ধরে কমলাকে দেখল ডাক্তার। তাকিয়ে তাকিয়ে।...'আপনার স্বামী ?'

'হ্যাঁ।'

আরও কিছু বলতে চাইছিল কমলা। কিন্তু বলা হল না। তার আগেই ডাক্তার উঠে পড়েছে।...'চলুন।'

সন্ধ্যা গাঢ় হয়েছে। ঘন হয়ে নেমেছে অন্ধকার। বস্তীর ছোট ছোট খুপরী ঘরে এক-আধটা আলো জ্বলছে। আর সব অন্ধকার ; কালো।

ডাক্তারকে দরজায় দাঁড় করিয়ে ঘরে ঢুকল কমলা। নিঃশব্দ, নিঃসাড় ঘর। থমথমে। নিতাই ঘুমুচ্ছে বুঝি। কিংবা যন্ত্রণায়, ব্যথায়, জ্বালায়, ক্লান্তিতে বেহুঁশ হয়ে রয়েছে। হুট্ করে একটা কি যেন বেরিয়ে গেল। বেড়াল-টেড়াল বুঝি ! কুলঙ্গি হাতড়ে দেশলাই নিল কমলা। ডিবে জ্বালল।

'আসুন।' ডিবে হাতে নিয়ে দরজার কাছে আলো ফেলে ডাক্তারকে ডাকল কমলা।

ডাক্তার হাতের ব্যাগ নামিয়ে, তক্তপোষের কোণে বসল। হাত টানল নিতাইয়ের। নাড়ি দেখল, চোখ টানল, বুকে হাত রাখল। তারপরই উঠে দাঁড়াল ডাক্তার।

—'কি ? কী হ'ল ডাক্তারবাবু !...' আচমকা রোগীর বিছানার কাছে সরে এল কমলা।

নিতাইয়ের দেহ ঠাণ্ডা, শীতল, হিম। শক্ত পাথর। নিতাই নেই।

হাতের মুঠো খসে পাঁচটাকার নোটটা বিছানার ওপর

পড়ল। কমলা দেখল সেটা। তাকাল ডাক্তারের দিকে। যেন ও বলতে চাইল—নাও ডাক্তার, টাকাটা তুলে নাও। ও টাকা তোমারই প্রাপ্য। তোমাদের।

কথা কইল না কমলা, কাঁদল না কিংবা জোরে, বুক গলা খালি করে নিশ্বাস ফেলল না। অদ্ভুত এক ঘোরে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ, মাথা ভার ভার। দৃষ্টি ঝাপসা, ঘোলাটে; কেমন শূন্য শূন্য। গা হাত পা—সমস্ত শরীর অসাড়, ক্লান্ত, অনড়। গলা শুকিয়ে আসছে, জিভ কাঠ এবং ঠোঁট দু'টো আমসির মত শুকনো চড়চড় করছে। বুকের ভেতরটা উদোম-আলগা উদাস এবং সেখানে খাঁ খাঁ শূন্যতায় কেমন একটা বাতাস আছড়ে পড়ছিল। চোখে কুয়াশা নামার মতন এক ভাব জমছে…

উপসংহার

'কোন ঘর···?'

'এই ঘর।'

কমলা যেন অনেক দূর থেকে এসে পৌঁছল এখানে। শহর ছেড়েছিল সকালে, স্রোতস্বতী নদীর কিনার ধরে তার গাড়ি আস্তে, অতি ধীর গতিতে আসছিল। রেললাইন পার হল, খালপুল পেরিয়ে ঢালু, নিচু পথে নামল গাড়ি। আরও এগিয়ে জলা-মাঠ।···কখন যে দিন শেষ হয়ে বিকেল নামল, আলো-মোছা ধূসরতা গাঢ় হতে হতে ধোঁয়া কি প্রথম কুয়াশা নামার মত ভাব নামল। দিনের শেষ কান্না কাঁদল কাতর চিল; ছোট বেতসের কুঞ্জে ডাহুক ডাকল আচমকা···কত পাখি আকাশের নীলাম্বরী পর্দায় ছবি হয়ে ফুটল—তাও পেরিয়ে কমলার গাড়ি চলছে···চলছে···চলছে; শেষকালে এখানে এসে থামল।

ঘরের বারান্দায় জমা লোকগুলোকে দেখল কমলা। এরা চোরের মতন ফিসফিস করে কথা বলছে। ঘরের কথা একবার শুধিয়েছে কমলা, এবার দরজা খুলল; আস্তে, ধীরে, অতি সন্তর্পণে; সতর্কতায়। ছোট শব্দ বাজল। কমলার মনে হল এই ঘর তার শৈশব থেকে চেনা। এই ঘর তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা অভিলাষের মতন। পরের ঘরটি বিশাল। কি হিম! আশা এখানে স্থবির হয়ে আছে। তারও পরের ঘর; কমলা দাঁড়াল। প্রখর তপ্ততা, জ্বালা—কমলা তার চেনা ঘরগুলি পার হয়ে এসে শেষ ঘরের দরজা খুলল। এক ঝলক বেগনি রঙ আছড়ে পড়ে তার দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত চকিত করল। সেই রঙ ফিকে হতে হতে হলদে, পরে তরল কালির মতন মিহি নীলচে ভাব ধরল।···এই নির্জন নিস্তব্ধ ঘরে অন্য এক

শান্ত স্তব্ধতা, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ ভাসছে। একটি মৃত-দেহ বিছানার ওপর সোজা সরল হয়ে শুয়ে, তার পা থেকে চিবুক পর্যন্ত ঢাকা ; মুখের অংশটা বাইরে। শিয়রের দিকে প্রদীপের সলতে পুড়ছে। মৃত্যু নরম আলো পড়েছে ফ্যাকাশে, অল্প ছাইরঙ মুখের ওপর। কমলার সত্তা যেন ধীরে ধীরে ফিরে আসছে···এল ; কমলা চিনল এই মৃত মানুষকে। নিতাই এখানে তার শেষ-শয্যায় শুয়ে। তার নিতাই···এবং এই তার কষ্টের দুঃখের শোকের দিন, সুতরাং কমলার মনে হল, তার চোখের তলার জলের ফোয়ারা ফাটল···ফাটল—জলন্ত বেদনা তার বক্ষ ছিঁড়ছে। জোরে কেঁদে উঠতে চাইল কমলা কোলের অন্ধকারে ; মৃত নিতাইয়ের কপালে চুমু খেতে চাইল মাথা নামিয়ে···আচমকা মনে হল, এই ঘরে সে একা নেই ; অন্য কেউ আছে। নিতাইয়ের শরীরকে জড়িয়ে ধরে, বুকের ওপর মুখ গুঁজে অত্যন্ত করুণ অস্পষ্ট স্বরে কাঁদছে একটি মানুষ। কমলা এগুতে গিয়ে দেখল, সেও মাথা তুলেছে, কপাল আড়াল করেছে নিতাইয়ের। না, সে ছুঁতে দেবে না নিতাইকে।···আমি ওকে কী বলব ? স্ত্রী ? কমলা কিছু ভাববার আগেই মেয়েটি কমলার হাত ধরল, শক্ত করে ; কান্না-চাপা গলায় ফোঁপাল, 'থাম, কোন অধিকার তোমার আছে যে চুমু খেতে আসছ ? সারাজীবন ধরে পালাতে চেয়েছ, পালাও···' আবার মাথা নামাল সে নিতাইয়ের বুকে। করুণ কান্নার এক অসহ্য হৃদয়-ছিঁড়ে নেওয়া সুর বাজছে।···কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কমলা হিম দৃষ্টি মেলে। আশ্চর্য, তার চোখের জল শুকলো। কান্না বিষাদ দুঃখ এবং আবেগ কঠিন শক্ত হল। কমলা তার অন্য রূপকে চিনল। চিনে চমকে উঠল।

ফিরে দাঁড়াল কমলা। যাবার জন্যে। দরজার কাছে

এসে পেছনে তাকাল। প্রদীপের সলতে পোড়া মৃদু মিহি আলোয় তার মনে হল, মৃত নিতাইয়ের মুখে হাসি ফুটেছে। প্রত্যয়ের, বেদনার এবং বাস্তবের হাসি। এই হাসি যেন বলল, 'আমি ভালবেসেছিলাম তোমাকে, এখন আগন্তুকের মতন এসে দাঁড়িয়েছ; চলে যাচ্ছ আবার। কিন্তু তাকে বলো, তুমি আমার ছিলে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করে ঠকতে চাইনি···।' কিন্তু কমলা গ্রাহ্য করল না। হাত তুলে চোখ ঢাকল। যেন নিজেকে সে চুরি করে দরজার বাইরে আনল; এক এক করে তার চেনা পুরনো আলো অন্ধকারের জড়াজড়ি ঘরের সীমানা পার হয়ে দ্রুতগতিতে বাইরে এসে দাঁড়াল।···এখানে ওরা ভিড় করে আছে অন্ধকারে চোরের মতন। চাপা গলায় কথা বলছে আত্মীয়-স্বজন বান্ধব এবং সমাজ।···আমি কি দাঁড়াব এখানে? না। কমলা পা বাড়াল। তার গতি ভয়ানক দ্রুত হয়ে আসছে। বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে দেওয়ালের ছায়ার মধ্য দিয়ে, ফণীমনসা, পাতাবাহারের কুঞ্জ পেরিয়ে সে ছুটছে অন্য পথের জন্যে। যেতে যেতে কমলার মনে হল, তার ভালবাসা মরল। যেহেতু সে তার পলাতক মন নিয়ে আর আগলে রাখতে চাইল না তাকে···